গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১৩ - ১৯ জানুয়ারি, ২০০৬ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

আদিবাসী জনগণের উপর পুলিশি বর্বরতাকে ধিক্কার জানালেন কমরেড নীহার মুখার্জী

কোনরকম প্ররোচনা ছাড়াই দরিদ্র আদিবাসী জনসাধারণের উপর গত ২ জানুয়ারি ২০০৬ ওড়িশার কলিঙ্গনগরে, পুলিশের পাশবিক নৃশংস আক্রমণ ও নির্বিচার গুলিচালনার ফলে যে ১৩ জন নিহত ও অসংখ্য মানুষ আহত হন এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ৩ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করে বলেন যে, একচেটে পুঁজিপতিরা যেভাবে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ছাড়াই বা ভবিষ্যতে বসবাস ও উপার্জনের ব্যবস্থা না করেই এইসব অত্যন্ত দরিদ্র শ্রেণীর আদিবাসী মানুষকে প্রাণধারণের জন্য তাদের একমাত্র সম্বল চাষযোগ্য জমি থেকে জোর করে উচ্ছেদ করতে চলেছে, তার বিরুদ্ধে আদিবাসী জনগণ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদই করেছেন। তিনি এই ঘটনার জন্য দায়ী ওড়িশার নবীন পট্টনায়ক পরিচালিত চরম জনবিরোধী বিজেডি সরকারের পদত্যাগ দাবি করেন এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার উপর এই ধরনের ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দেশের জনগণকে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। তিনি আরও দাবি করেন যে, শ্রমজীবী জনতার দরিদ্রতম অংশ এই আদিবাসী জনগণ, যারা ন্যূনতম সুযোগসুবিধা থেকেও বঞ্চিত — তাদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ না দিয়ে বা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম আর্থিক সুরক্ষার ব্যবস্থা না করে এইরকম অমানবিক নিষ্ঠুর উচ্ছেদের প্রক্রিয়া এখনই বন্ধ করতে হবে।

৭ জানুয়ারি ওড়িশা বন্‌ধ ও অন্যান্য রাজ্যে প্রতিবাদ দিবস

আটের পাতায়

কৃষকদের বিদ্যুৎমাশুল কমানোর প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হল সরকার

কৃষি বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধিতে চরম বিপর্যস্ত চাষীরা শেষপর্যন্ত অনশন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাঁদের নায্য দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে, কিছু দাবি আলোচনার টেবিলেই পূরণ করে মুখ্যমন্ত্রী সেই মতো বিদ্যুৎ পর্ষদকে আদেশ দিতে বাধ্য হলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ জয়ের জন্য এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গরিব চাষীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এতদিন যে সরকার কৃষকদের এই ন্যায্য দাবির কোন গুরুত্ব দেয়নি, ৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া আমরণ অনশনের কর্মসূচি ৪ দিন চলার পরই সেই সরকার বাধ্য হয় আলোচনায় বসতে। এই ৪ দিনে দফায় দফায় পুলিশের গাড়ি ও সরকারি অ্যাম্বুলেন্স অনশনস্থলে এসেছে, গুরুতর অসুস্থতার লক্ষণ যেসব চাষীদের শরীরে ফুটে উঠছিল, চিকিৎসকদের পরীক্ষায় ধরা পড়ছিল, তাদের হাসপাতালে জোর করে তুলে নিয়ে যেতে। কারণ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েও অনশনকারীরা স্থান ছেড়ে যেতে নারাজ। এই অবিশ্বাস্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হতে সাংবাদিকরা ছুটে এসেছেন। প্রশ্ন করতেই বাঁকুড়ার ওন্দা থেকে আসা কৃষক জয়দেব কর বললেন, ''চাষের জন্য কৃষকদের বিদ্যুৎ দেয় না যে সরকার, তার হাসপাতালে গিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চাই না।'' বিস্মিত এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছেন, ''আপনার শরীরের এই অবস্থায় এখনই চিকিৎসা না হলে আপনি মারা যেতে পারেন।'' ঐ চাষী জবাবে বললেন, ''কত লোকই তো বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, আমারও নাহয় সেটাই হবে, তার বিনিময়ে যদি বিদ্যুতের দাম কমে, তবে সমাজের ভাল হবে।'' এমন করে যে একজন চাষী আজকের দিনে ভাবতে পারেন, দাবি আদায়ের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত হতে পারেন, তরুণ সাংবাদিকের তা বোধহয় চিন্তার অতীত ছিল। তাঁর সংবেদনশীলতায় চাষীর এই মনোভাব এমন অনুরণন তুলল যে, ঐ সাংবাদিক চোখের জল আটকাতে পারলেন না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, ''লড়াই করুন, আমরা আছি আপনাদের সাথে।'' অনশনের তিনদিনের মাথায় জয়দেববাবুর মতো অনেকেরই শরীরের অবস্থা অবনতির দিকে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা, পেটে আমাশয়ের প্রকোপ, দেহের পেশীগুলো শিথিল হয়ে আসছে। ৫ জানুয়ারি দুপুরেই পুলিশ অনশন থেকে ৭ জনকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে হাসপাতালে, কিন্তু আরও অনেককেই পারেনি। নদিয়ার করিমপুরের কৃষক আজাদ রহমান আর্সেনিকের রোগী। অনশনে শরীরের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শত অনুরোধেও হাসপাতালে যেতে রাজি হননি। বললেন, ''দাবি আদায়ের প্রয়োজনে মরব।'' বীরভূমের লাভপুর থেকে এসেছেন ৭৪ বছরের চাষী অনাদি কিঙ্কর মণ্ডল। চারদিন জলস্পর্শ করেননি তিনি। পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করলে তিনি দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দেন, ''আমাকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে, ধর্মতলার মোড়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করব।'' এই দৃঢ়তার কাছে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয় পুলিশ। অনাদিবাবুকে প্রশ্ন করা হয় — এই বয়সে কেন এলেন অনশন আন্দোলনে? দুঃখের কাহিনী জানিয়ে বললেন, ''তিন ছেলে বেকার, সামান্য চাষটুকু সম্বল, সেটুকু যদি যায় তবে সপরিবারে না খেয়ে মরতে হবে। নিজে প্রাণ দিয়েও তাই বিদ্যুতের দাম কমাতে চাই।''

৩রা জানুয়ারি থেকে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর নেতৃত্বে প্রায় এক হাজার বিদ্যুৎগ্রাহক আমরণ অনশনে বসেছিলেন এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে। তাঁদের দাবি, কৃষি বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, পুনরায় মাশুল বৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল, কৃষিতে মিটার, ৩ একর পর্যন্ত বিনা পয়সায় ও বাকিদের ৫০ পয়সা ইউনিটে এবং গরিব-মধ্যবিত্ত গৃহস্থ এবং ক্ষুদ্রশিল্প ও ক্ষুদ্রব্যবসায়ীদের ১ টাকা ইউনিটে বিদ্যুৎ দিতে হবে। এদিন দুপুরে অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কৃষক সহ নানা স্তরের বিদ্যুৎগ্রাহক কলেজ স্কোয়ার থেকে সুসজ্জিত মিছিল করে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে

তিনের পাতায় দেখুন

যে দাবিগুলি সরকার মেনে নিয়েছে

- **বিদ্যুতে ভর্তুকির দাবি সরকার মেনে নিয়েছে। ভর্তুকির পরিমাণ কী হবে, ৭ দিনের মধ্যে তা লিখিতভাবে সরকার জানাবে।**
- **গুলিবিদ্ধ খুদ্দার সেখকে ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেবে। অন্যান্য আহতদেরকেও ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে।**
- **সল্টলেকে গুলিচালনার ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত হবে।**
- **বিল বয়কটকারী কৃষকদের কাটা লাইন নিঃশর্তে জুড়ে দেওয়া হবে।**
- **যারা বিল বয়কট করেছেন তাদের ফাইন দিতে হবে না।**

এই কলকাতাই আপনারা চাননি কি

[জনৈক পাঠক নীচের চিঠিটি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে জানিয়েছেন যে, তিনি এটি আনন্দবাজার পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা প্রকাশ করেনি। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করে আমরা সেটি ছাপলাম। — স.গ]

পত্রিকার সম্পাদককে সম্বোধন করে পত্রলেখক লিখেছেন ঃ

"২৭ ডিসেম্বর, ২০০৫-এর আনন্দবাজার পত্রিকার লিড নিউজের ক্যাপশান — 'না, এই কলকাতাকে আমরা চিনি না।' — যাতে কলকাতার রাজপথে একটি অসহায় মৃত্যুর মর্মান্তিক ছবি ছাপা হয়েছে।

প্রতিবেদক কেন চিনতে পারলেন না জানি না, কিন্তু এই তো সেই কলকাতা যার সাধনা আমরা দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছি। অন্যের দুঃখ-বেদনা নিয়ে মাথা না ঘামানোর কলকাতা, শুধু নিজেরটা নিয়ে বেঁচে থাকার সাধনামগ্ন কলকাতা, 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' মন্ত্র জপার কলকাতা, যে কলকাতা পাশের বাড়ির মানুষের নামটাও জানে না — এই কলকাতাই তো আমরা অনেকদিন ধরেই চাইছি। এই তো সেই 'কাজ'-এর কলকাতা, যে কলকাতার যুবসমাজ সামাজিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায় না, সারাদিন শুধু টাকা-আনা-পাই-এর জগতে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে এক বিন্দু 'শান্তি' কিনতে ঢুকে পড়ে কোন শুঁড়িখানায় বা নৈশক্লাবে, অথবা কোন নারীমাংসের দোকানে অর্থের বিনিময়ে একপোয়া বা এক ছটাক 'ভালবাসা' কিনতে। এই কলকাতাই তো আমরা গড়ে তুলতে চেয়েছি, যে কলকাতায় শুধু থাকবে মানবতাহীন, মানুষের মতো দেখতে কিছু যন্ত্র — যার নাক, চোখ, মুখ, মস্তিষ্ক থাকতেও নেই ; যে কলকাতা 'গ্যাস খেয়ে ক্ষুদিরাম' হতে রাজি নয়, — রাজি নয় সামাজিক কাজে 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে'। যে কলকাতা চোখের সামনে মানুষকে মরতে দেখলেও ফিরে তাকায় না ; ভিড় থেকে সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে ..."হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই উনি যদি মারা যেতেন, তাহলে পুলিশ আমাদের নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতো, তাই আর ঝামেলায় জড়াইনি" — একথা নির্বিকারচিত্তে বলতে পারে।

প্রতিবেদকের লেখায় একটা বিষাদের সুর বেজেছে। কিন্তু এ ঘটনাতো বিষাদের নয়, এতো আনন্দের — এতো গর্বের।

এ ঘটনা তো প্রমাণ করল, এতদিনে সকলে মিলে — কেউ সচেতনভাবে, কেউ বিভ্রান্তিতে, আবার কেউ বা উদাসীনতায় আমাদের একসময়ের সংবেদনশীল কলকাতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের পর্যায় জুড়ে তো বটেই, তারপরেও ৬০-এর দশক, ৭০ দশক পর্যন্ত স্বার্থপরতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, জাত-পাত-প্রাদেশিকতার আবর্জনামুক্ত প্রাণোচ্ছল কলকাতা, শাসকদের শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ লড়াই-মিছিল-হরতাল ও ব্যারিকেড ফাইটের কলকাতা, যা ছিল আমাদের বঙ্গেশ্বর দিল্লীশ্বরদের 'দুঃস্বপ্নের নগরী' — তার প্রাণভোমরাকে পঙ্কিল, অবক্ষয়িত, সর্বগ্রাসী মার্কিনী সংস্কৃতির যুপকাষ্ঠে বলি দিতে পেরেছি। পেরেছি এতদিনে মানুষের ভোরে ঘুম ভাঙা থেকে রাতে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত জীবনের সব প্রয়োজনীয় সামগ্রী শুধু নয়, মানুষের জীবনযাত্রা, আমোদ-প্রমোদ, রুচি-সংস্কৃতি, আশা-আকাঙ্ক্ষা — এমন কী স্বপ্ন দেখাটাও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ছাঁচে ঢেলে ফেলতে। পেরেছি স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসা-সহমর্মিতা এসবকেও বাজারের পণ্য করে দিতে — যাতে মানুষ শুধুমাত্র নির্জলা ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের মাপকাঠিতে এসবের দরদাম ধার্য করে।

এই তো উন্নয়ন ; এতদিনে বিশ্বায়ন, উদারীকরণের দমকা হাওয়ায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, সুভাষচন্দ্রের মানবতাবাদী মূল্যবোধ, রুচি, সংস্কৃতি আদর্শবোধকে ছেঁড়া কাগজের মতো উড়িয়ে দিয়ে আমরা শুধুমাত্র 'ধান্দা'-র নেশায় মাততে পারলাম। আর সে কাজে তো আনন্দবাজারকেই পেয়েছি সবচেয়ে বড় সহায়ক রূপে। নিজেকে ছাড়া, নিজের ভোগকে ছাড়া বাকি জগৎকে ভোলার শিক্ষা আমরা তাদের কাছেই সবচেয়ে ভালভাবে পেয়েছি। নয় কি ?

বিশ্বায়ন ঘটলো আমাদের অর্থনীতির, বিশ্বায়িত হলাম আমরা। একমেরু বিশ্বের অধিপতির সাথে একাসনে বসার যোগ্যতা অর্জিত হল এতদিনে। তবে আর আক্ষেপ কেন ? কারণ আক্ষেপেরও পণ্যমূল্য আছে। বিশ্বায়নের বাজারে মানবিক বেদনাও নগদ দামে বিক্রি হয়।

জানি, আমাদের প্রিয় কলকাতার এই মৃত্যুমুখী অবস্থা দেখে অনেকেরই দুঃখ হয়, ব্যথায় বুকটা ফেটে যায়। কিন্তু ব্যথা পাওয়া তো কেবল ব্যথার জন্যই নয়, তার তাৎপর্য যদি বুঝি, তাহলে আমাদের সকলকেই আজ গর্জে উঠতে হবে। শোষণ-জুলুম বেড়েছে বই কমেনি। আবার ফিরিয়ে আনতে হবে সেই মিছিল নগরীকে, ব্যারিকেড লড়াইয়ের কলকাতাকে। তবেই আমাদের একদা চেনা কলকাতাকে আবার আমরা চিনতে পারব।

মুন্সী প্রেমচন্দ স্মরণে আলোচনা সভা

সমাজের সর্বস্তর থেকে আগত প্রায় পাঁচ শতাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে গত ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় মানবতাবাদী কথাসাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচন্দের ১২৫তম জন্মবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল সারা বাংলা প্রেমচন্দ ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটি। ভারতবর্ষের নবজাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে কমিটির উদ্যোগে বর্ষব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে হলের প্রবেশ পথের পাশে আয়োজন করা হয়েছিল বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষায় প্রেমচন্দের রচনাংশের বর্ণময় প্রদর্শনী, যা পথচলতি বহুমানুষকে আকৃষ্ট করে। মূল অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি সাহিত্যবিভাগের প্রধান ডঃ বিমল। বার্ধক্য উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানে এসেছিলেন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞানী সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়। সূচনাতে মঞ্চে উপবিষ্ট সকলেই প্রেমচন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। যোগমায়া দেবী কলেজের ছাত্রীদের দ্বারা উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর শুরু হয় 'বর্তমান সমাজে প্রেমচন্দের জীবন সংগ্রাম ও সাহিত্যের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক আলোচনা। আলোচনার ও সমগ্র অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্যামল সেন বলেন, প্রেমচন্দের নিজের জীবন যেমন ছিল দুঃখদুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রামের, তেমনি তাঁর সাহিত্যেও সমাজের অবহেলিত দুঃখী মানুষের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমান অবক্ষয়ের সময়ে প্রেমচন্দের মতো সাহিত্যিকের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পশ্চিমবাংলায় এই ধরনের সভা ও এত জনসমাগম, সত্যিই আমাদের মধ্যে আশা ও প্রেরণা জোগায়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী, মহান সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনীকার বিষ্ণু প্রভাকর, প্রেমচন্দের দৌহিত্র এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অলোক রাই এবং যোগমায়া দেবী কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও সারা বাংলা প্রেমচন্দ ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটির সভাপতি ডঃ সন্তনারায়ণ উপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনিবার্য কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে না পেরে যে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছিলেন সেগুলি পড়ে শোনানো হয়।

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, যারা এই ধরনের চর্চা আন্তরিকতার সাথে করার চেষ্টা করছে তাদের প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এমন একটা অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি গর্বিত।

এরপর আলোচ্য বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিজ্ঞানের অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার রবি, আলোচনা করেন মুস্তাফা আকবর ও বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক মানিক মুখোপাধ্যায়। শ্রী মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে সাহিত্যের প্রতি প্রেমচন্দের দৃষ্টিভঙ্গি এবং সামাজিক আন্দোলনের পরিপূরক করে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে প্রেমচন্দের আজীবন সংগ্রামের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করেন।

কমিটির সম্পাদিকা সঙ্গীতা মিশ্র ও সহসভাপতি ডঃ মৃদুল দাস অতিথিদের হাতে তুলে দেন প্রেমচন্দের উদ্ধৃতি ও চিত্রসম্বলিত স্মৃতিফলক এবং পুস্তিকা।

কমিটির পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে আয়োজিত রাজ্যস্তরীয় ত্রিভাষী (বাংলা, হিন্দি, উর্দু) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ১৩২ জন বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রদান করেন সারা বাংলা প্রেমচন্দ ১২৫তম জন্মবার্ষিকী কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর বিশিষ্ট সদস্য এবং এদিনের সভার সভাপতি ডঃ বিমল।

এ আই ডি ওয়াই ও'র আঞ্চলিক সম্মেলন

হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ ঃ ২০-২১ ডিসেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও'র হরিহরপাড়া থানা কমিটির উদ্যোগে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন উপলক্ষ্যে ২০ ডিসেম্বর লাঠি খেলার আয়োজন করা হয়। প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড সামসুল আলম। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির সদস্য কমরেড খাদিজা বানু। প্রকাশ্য সভার শেষে গত ২৭ অক্টোবর সল্টলেকে বিদ্যুৎভবনের সামনে কৃষকদের বিক্ষোভ আন্দোলনে পুলিশের ব্যাপক লাঠি-গুলি চালানোর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। প্রতিনিধি সভায় আলোচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ। কমরেড গোলাম আম্বিয়াকে সম্পাদক ও কমরেড রমেন শীলকে সভাপতি করে মোট ২৪ জনের কমিটি গঠিত হয়।

লোচনপুর ঃ ১ জানুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও'র লোচনপুর লোকাল কমিটির দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উপলক্ষ্যে ৩১ ডিসেম্বর একটি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ঢালাও মদের লাইসেন্স ও অনলাইন লটারির বিরুদ্ধে, সকল বেকারের কাজ ও বেকিবাগান হাসপাতাল চালুর দাবি সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে প্রস্তাব পাঠ এবং আলোচনা হয়। সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক পরিবেশনে অনেকে অংশ নেন। সম্মেলন থেকে কমরেড সাজ্জাদ হোসেনকে সম্পাদক ও কমরেড শাহজামাল হককে সভাপতি করে ১১ জনের কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনে এস ইউ সি আই লোচনপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মণিরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।

নোনাকুড়ি, মেদিনীপুর ঃ গত ১ জানুয়ারি এ আই ডি ওয়াই ও'র নোনাকুড়ি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে বেকারী, অপসংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ সহ যুব জীবনের নানান সমস্যা সমাধানের দাবিতে বল্লুক নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই মেদিনীপুর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড তপন ভৌমিক। যুব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপায় নিয়ে বক্তব্য রাখেন ডি ওয়াই ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড স্বপন দেবনাথ এবং বাসুদেব সামন্ত। সম্মেলনে গোপাল সিংহকে সম্পাদক ও সোমনাথ ভৌমিককে সভাপতি করে আঞ্চলিক যুব কমিটি গঠিত হয়।

এ আই ডি এস ও প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত

উত্তর দিনাজপুর ঃ এ আই ডি এস ও'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় ২৯ ডিসেম্বর রায়গঞ্জ মাড়োয়ারি ভবনে। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল সাহু। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড দুলাল রাজবংশী। সভাপতিত্ব করেন জেলা সভানেত্রী কমরেড মাধবীলতা পাল। কমরেড গোপাল সাহু বলেন, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যের সিপিএম-ফ্রন্ট সরকার চক্রান্ত করছে গরিব ঘরের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে শিক্ষাকে কেড়ে নেওয়ার। আর তাদের তল্পিবাহক এস এফ আই এবং সি পি ছাত্রস্বার্থে আন্দোলন না করে সরকারের ছাত্রস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তকে দুই হাত তুলে সমর্থন করছে। যথার্থ আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য কলেজে কলেজে ডি এস ও কর্মীদের উপর আক্রমণ করছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের নাম করে প্রাথমিক শিক্ষার ভিতকে ধ্বংস করছে। স্কুলস্তরে যৌনশিক্ষা চালু করছে যা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেবে, মূল্যবোধ-নীতি-নৈতিকতার অবনমন ঘটাবে। সরকারের এই সর্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত ছাত্র প্রতিনিধিদের কাছে আহ্বান রাখা হয়।

পুরুলিয়া ঃ শিক্ষার ওপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লাগাতার হামলা রুখে দিতে পুরুলিয়ার হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে ছাত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে ২৮ ডিসেম্বর উদ্‌যাপিত হল এ আই ডি এস ও'র ৫২তম প্রতিষ্ঠা দিবস। সভায় সভাপতিত্ব করেন এ আই ডি এস ও'র পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড পরীক্ষিত গরাঁই। অতীত দিনের যে সমস্ত সংগঠকেরা সংগঠনকে গড়ে তুলেছেন তাঁরা তাঁদের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা, এ আই ডি এস ও'র নবীন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেন। এরপর যে সমস্ত সংগঠকরা বর্তমানে কলেজে কলেজে সংগঠন গড়ে তুলছেন তাঁরা বক্তব্য রাখেন। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি কমরেড সুব্রত গৌড়ী ও অতীত দিনের এ আই ডি এস ও নেতৃবৃন্দ। এদিন পুরুলিয়া ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে মনীষীদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অধ্যাপক আজিজুল হক।

ডালখোলা কলেজে এস এফ আই-এর তাণ্ডব

গত ৯ ডিসেম্বর ডালখোলা কলেজে এ আই ডি এস ও কর্মী সেখ রাইসুদ্দিন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর অধ্যক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ ও পুলিশের সামনে থেকেই তাকে প্রায় ৫০ জন এস এফ আই কর্মী ও তাদের মদতপুষ্ট কিছু বহিরাগত ব্যক্তি মারতে মারতে তুলে নিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করার পর করণদীঘি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ আই ডি এস ও'র মনোনয়নপত্রগুলিও বাতিল করা হয়। কলেজে ব্যাপকহারে ফি-বৃদ্ধি ও নানা অব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও'র আন্দোলনের আশঙ্কা থেকেই এই আক্রমণ। ২৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের পর র‍্যাফ দিয়ে ছাত্রদের উপর আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে।

অবিশ্বাস্য দৃঢ়তায় চাষীরা বলেছে, মরতে হলেও আন্দোলনে আছি

একের পাতার পর

পৌঁছান। মিছিলে যেমন ছিলেন কয়েক মাস ধরে বিদ্যুৎ বিল বয়কট চালিয়ে যাওয়া নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগণার কৃষকরা, তেমনই এসেছেন ২৭ অক্টোবর সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনে পুলিশি অত্যাচারে আহত গ্রাম-শহরের গ্রাহকরাও। সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সামনে রেখে অনশনকারীরা দলবদ্ধভাবে হেঁটে যাচ্ছিলেন অনশনস্থলের দিকে। মিছিল থেকে ঘন ঘন দাবি উঠছিল — কৃষকদের বিনাপয়সায় বিদ্যুৎ দিতে হবে, সল্টলেকে গ্রাহকদের ওপর গুলিচালনার তদন্ত করে দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে, আহতদের চিকিৎসার খরচ সরকারকে দিতে হবে। চাষীদের হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান — 'আমি তুমি সর্বজাতি/সবার বন্ধু বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতি।' 'কৃষক জাতির মেরুদণ্ড/কমাও বিদ্যুতের মাশুল দণ্ড।' অনশনস্থল এসপ্ল্যানেডের দিকে রাস্তার দু-দিক ছাপিয়ে এগিয়ে চলা মিছিল — দৃপ্ত ভঙ্গিমায়, আবেগের গভীরতায়, উচ্চকিত স্লোগানে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল পথচারীদের। পথের দ্রুতগতি মানুষ দাঁড়িয়ে পড়ছিল মিছিল দেখতে। মিছিলকারীদের মুখে যে তাদেরই নিজস্ব দাবি। তারাও তো মনেপ্রাণেই চায়, এ অন্যায়ের প্রতিকার হোক। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের জুলুমের বিরুদ্ধে জঙ্গি প্রতিবাদ হোক।

এ রাজ্যের ব্যাপক জনতার মনের এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাই সেদিন যেন মূর্ত রূপ ধারণ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলছিল রাজপথ ধরে। তা দেখেই তো তারা আর পা তুলতে পারেনি, যতক্ষণ না মিছিল শেষ হয়েছে দাঁড়িয়ে থেকেছে মিছিলের দাবির সঙ্গে একাত্ম হয়ে। বউবাজারের মোড়ে একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী অভিজিৎ ঘোষ বললেন, ''মিছিলে মানুষের সাময়িক অসুবিধা হয় ঠিকই, কিন্তু এঁরা যে দাবি নিয়ে লড়ছেন, তা তো সকলেরই দাবি। এই আন্দোলন সম্পূর্ণ সমর্থন করি।'' স্টেশনারি দোকানের মালিক প্রবীর দাস বললেন, ''দাবি আদায়ের প্রয়োজনে এটুকু অসুবিধা তো মানতেই হবে।'' ব্যবসায়ী গৌরীশঙ্কর জয়সোয়াল স্কুটার নিয়ে আটকে পড়েছিলেন মিছিলে। তাঁর কথায়, ''আন্দোলন সফল হলে সকলেই লাভবান হবে, ফলে একদিনের একটু অসুবিধা মেনে নিতেই হবে।''

মিছিল এসপ্ল্যানেড পৌঁছাতে সামনে দেখা গেল বিশাল পুলিশবাহিনী, র‍্যাফ-কমান্ডো নিয়ে অপেক্ষা করছে। যেন যুদ্ধ প্রস্তুতি। পুলিশের অগুনতি ভ্যান চারদিক দিয়ে যেন ঘিরে রেখেছে অনশনস্থলটিকে। সাময়িক ছাউনি তৈরি করা হয়েছিল অনশনকারীদের জন্য, যার মধ্যে প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা অদ্ভুতভাবে প্রতিফলিত হচ্ছিল। হাজারের উপর মানুষ অনশন করবেন, অথচ ফুটপাতটুকু ছাড়া ছাউনি করার অনুমতি দেয়নি পুলিশ, তৈরি মঞ্চ ভেঙে দিয়ে অর্ধেক করে দিয়েছে। শীতের রাতে, খোলা ধর্মতলার রাস্তায় অনশনকারীরা বসবেন, সাথী হিসাবে আরও শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক, সংগঠনের সদস্যরাও রাত কাটাবেন — এত জনের স্থান সঙ্কুলান হওয়াই দায়। কতদিন, কত রাত অনশন আন্দোলন চলবে, জানা ছিল না। অনশনস্থলে ছিল না গদি তাকিয়ার ব্যবস্থা, শুধুই ফুটপাতের উপর পাতা ডেকরেটর কোম্পানির কাপড়। তবুও সকলেই অকুতোভয়। সাহসী মনের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞার বার্তা বুঝিয়ে দিতেই অনশন শিবিরের গায়ে শহীদ যতীন দাসের ছবি স্থাপনা করা হয়েছিল — পরাধীন ভারতে ৬৩ দিন অনশনের মধ্য দিয়ে যিনি আত্মত্যাগের অতুলনীয় চির অম্লান দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

শহীদের ছবিতে মাল্যদান করে অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস বিকাল সাড়ে তিনটায় অনশনের সূচনা ঘোষণা করলেন, নিজেও অংশ নিলেন অনশনে। শহীদ যতীন দাসের ছবির উপস্থিতি এই আন্দোলনের যথার্থ সংগ্রামী বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করে দিচ্ছিল প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। অনশন আন্দোলনের প্রচার হয়েছে সারা রাজ্য জুড়ে। এই আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিল এস ইউ সি আই। অ্যাবেকা'র কর্মীদের পাশাপাশি এস ইউ সি আই কর্মীরা সর্বত্র ওয়ালিং, পোস্টারিং, পথসভা করেছেন। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় অনশনের সমর্থনে এস ইউ সি আই-এর ব্যানার চোখে পড়েছে। অনশনস্থলে ফুলচাষী সমিতির পক্ষ থেকে প্রত্যেক অনশনকারীর হাতে গোলাপ ফুল তুলে দেওয়া হয়।

সঞ্জিত বিশ্বাস জানালেন, কৃষকদের এই অনশন আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে নানা কর্মসূচির ভিত্তিতে চলতে থাকা আন্দোলনের পথ বেয়ে এসেছে। রাজ্য সরকার কৃষিক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়েছে ১০০ শতাংশ। এই দামে বিদ্যুৎ কিনে কৃষকদের সেচের কাজ করতে হলে জমিতে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে, না হলে জমি বিক্রি করে পথের ভিখারিতে পরিণত হতে হবে। অন্ধ্রপ্রদেশে ও অন্যান্য রাজ্যে হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করেছে। ক্রমাগত সঙ্কটের আবর্তে পড়া পশ্চিমবঙ্গের কৃষক জীবনেও এই মর্মান্তিক ঘটনা এরপর এড়ানো যাবে না। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। সিপিএম নেতারা নতুন স্লোগান তুলেছেন, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি', অথচ সেই 'ভিত্তি'কেই আজ তাঁরা ধসিয়ে দিচ্ছেন।

তিনি বলেন, অনশনের সিদ্ধান্ত আমরা হঠাৎ করে নিইনি। আন্দোলনের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি। আন্দোলনের বর্তমান পর্যায়ের শুরু গত বছরের ৩০ জুন থেকে। ইতিমধ্যে এলাকায় এলাকায় বিদ্যুৎগ্রাহকরা পর্ষদের আঞ্চলিক অফিসে, জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দিয়েছেন, পথ অবরোধ করে পুলিশি অত্যাচারে রক্তাক্ত হয়েছেন। আমরা দিল্লিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে ধরনা দিয়েছি, বিদ্যুৎমন্ত্রী, রাজ্যপাল — সকলের কাছে গিয়েছি, কৃষকদের অসহায়তার কথা তুলে ধরেছি। কোথাও সমাধান হয়নি। অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, আন্দোলন তীব্র করা ছাড়া পথ নেই। গত ২৬ ডিসেম্বর আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলাম আলোচনার জন্য। তিনি কোন গুরুত্বই দেননি। বরং একদিকে সিপিএম প্রচারপত্র বিলি করে মিথ্যা প্রচারে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে, অপরদিকে সরকার পুলিশ দিয়ে গ্রামে গ্রামে হামলা চালিয়েছে, চাষীদের বিদ্যুতের লাইন কেটে দিয়েছে, মিথ্যা কেসে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরেছে। কিন্তু অত্যন্ত আনন্দের কথা, গর্বের কথা — আন্দোলন ভাঙা যায়নি। বরং প্রতিরোধ আন্দোলন আরও শক্ত, আরও ব্যাপক হয়েছে। ৭৭৬ জন অনশনকারীর সংখ্যা ঘোষণা করে তিনি জানালেন, এই সংখ্যা আরও বাড়বে।

অ্যাবেকা'র সহ সম্পাদক অমল মাইতি তাঁর ভাষণে প্রশ্ন তুললেন, ''হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে শ্রমিকদের উপর পুলিশি নির্যাতনে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত যেসব সাংসদ ছুটে গিয়েছিলেন, নিজের রাজ্যের সল্টলেকে বিদ্যুৎগ্রাহকদের উপর বর্বর অত্যাচারের ঘটনায় তাঁদের দেখা গেল না কেন ?'' এছাড়াও হুগলির প্রদ্যুৎ চৌধুরী, বীরভূমের নূর ইসলাম, নদিয়ার চন্দন চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদের কুণাল বিশ্বাস, উত্তর ২৪ পরগণার অনুকূল ভদ্র ও আরও অনেকে এই আন্দোলনের ইতিহাস ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন।

আমরণ অনশনে সামিল কৃষকরা

পরের দিন যথার্থই অনশনকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৯৪৫। রাজ্যের নানা জেলা থেকেই গ্রাহকরা অনশনে অংশগ্রহণ করেছেন। মধ্য চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ধানকল, গমকল সহ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী বিভিন্ন পেশার মানুষ ছিলেন এই অনশনে। মানুষ এসেছেন শ'য়ে শ'য়ে, কোথাও এসেছেন প্রতিনিধিত্বমূলক। নদিয়ার রানাঘাট থেকে এসেছেন ৪০০ জন, অনশনে বসেছেন ৫০ জন। এই আন্দোলনে সাহায্যকারী 'মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার'র চিকিৎসকরা অনশনে আগ্রহী বহুসংখ্যক বিদ্যুৎগ্রাহককে শারীরিক কারণে অনুমতি দিতে পারেননি। হাওড়া থেকে অন্যান্যদের নিয়ে এসেছেন স্বপন খাঁড়া। বললেন, ''আমাদের এই আন্দোলনের পথ চেয়ে রয়েছেন এলাকার ১৬০০০ বিদ্যুৎ গ্রাহক।'' হরিণঘাটা থেকে এসেছেন ৫০ জন কৃষক, অনশনে বসেছেন ৭ জন। তাঁরা জানালেন, ''চাষবাসের কোন রাস্তাই আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, স্যালো পাম্পের বিদ্যুৎ মাশুল ৫৬০০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১২০০০ টাকা।'' ক্ষুদ্র চাষী আয়ুব আলি মণ্ডল তীব্র ক্ষোভ নিয়ে বললেন, ''আমরাই রক্ত দিয়ে তৈরি করেছি বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, আর আজ সরকার আমাদেরই অনাহারে মারতে চাইছে।'' আবেগঘন কণ্ঠে তিনি বললেন, ''সল্টলেকের মত এখানেও যদি পুলিশ অত্যাচার চালায় তবুও আন্দোলন চলবে।'' হাবড়া থেকে এসেছেন ৩০ জন কৃষক। তাদেরই একজন মানিক মজুমদার জানালেন, ''যেখানে বার্ষিক হারে বিদ্যুতের মাশুল নেওয়ার কথা, সেখানে ৯ মাসেই পর্ষদ বিল পাঠিয়েছে ১০,৪০০ টাকা।'' তিনি বলেন, ''রাজ্যের সরকার এখন মেহনতি মানুষের নয়, ধনীদের সরকার।''

বক্তব্য রাখছেন কে কে এম এস রাজ্য সভানেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী। মঞ্চে সদানন্দ বাগল ও সেখ খোদা বক্স

অনশন আন্দোলনের শুরুতে সরকার কোন গুরুত্ব না দিলেও অনশনকারীদের দৃঢ় মনোবল

পাঁচের পাতায় দেখুন

অনশনকারীদের সমর্থনে ঃ (বাঁদিক থেকে) ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, কে কে এম এস, এম এস এস, ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও'র মিছিল

পঞ্চায়েতের হাতে চার্জশিট দেওয়ার ক্ষমতা
শিক্ষকদের সরকারি দলের আজ্ঞাবহে পরিণত করার ঘৃণ্য চক্রান্ত

সম্প্রতি চীফ সেক্রেটারির এক আদেশ বলে জানান হয়েছে — এখন থেকে পঞ্চায়েত এ'রাজ্যের স্কুল শিক্ষকদের কাজকর্মের মূল্যায়ন করবে এবং তাদের হাতে চার্জশিট দেওয়ার ক্ষমতাও থাকবে। আমরা সুস্পষ্টভাবে মনে করি, একাজের উদ্দেশ্য শিক্ষকদের এখনও যতটুকু স্বাধীনতা আছে তা সম্পূর্ণ খর্ব করে তাদের সরকারি দলের আজ্ঞাবহে পরিণত করা। এর মধ্য দিয়ে শাসকগোষ্ঠী তাদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে চাইছে। যে কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই ধরনের কার্যকলাপের প্রতিবাদ না করে পারেন না। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষকসমাজও এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠবেন।

শিক্ষকদের শাসকদলের ক্রীড়নকে পরিণত করার অপচেষ্টা এটাই প্রথম নয়। বৃটিশ আমল থেকে এই ধরনের অপচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। তারপর কংগ্রেস আমলেও শিক্ষাক্ষেত্রে নানা দলবাজি ও শিক্ষার স্বাধিকার হরণের ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে বহু আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারের রাজত্ব।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতাসীন হয়ে এই সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে মারাত্মক আক্রমণগুলি নামিয়ে আনে তার মধ্যে ছিল সিলেবাস, পাঠক্রম সহ শিক্ষার বিভিন্ন দিক, যেমন প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পঠনপাঠন এবং পাশ-ফেল তুলে দেওয়া, চতুর্থ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার বিলোপসাধন, ব্যাকরণ বর্জিত ''ফাংশনাল ইংলিশ টাইপ''-এর ইংরেজি শিক্ষা, ডিগ্রিস্তরে ইংরেজি এমনকী মাতৃভাষাকেও ঐচ্ছিক করা এবং পাশ নম্বর অনেক কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এর পাশাপাশি নেমে আসে শিক্ষা পরিচালন সংস্থাগুলির উপর নগ্ন আক্রমণ। আগে এগুলির যতটুকু আপেক্ষিক স্বাধীনতা ছিল তাও হরণ করে শাসকদলের কুক্ষিগত করার জন্য হীন আক্রমণ শুরু হয়। এই অপচেষ্টার মধ্যে লক্ষ্যণীয় দিকগুলি হল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সংস্থার স্বাধীনতার উপর আক্রমণ এবং কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির নির্বাচিত গভর্নিং বডিগুলি বাতিল করে বহু ক্ষেত্রে দলীয় ব্যক্তিদের প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ করা ইত্যাদি। এগুলির মাধ্যমে দলবাজির এক ঘৃণ্য প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে শুরু হয় যা অতীতের ঘটনাবলীকে ম্লান করে দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষাজগতে এর প্রতিফলন ঘটে আরও ব্যাপকভাবে। জেলায় জেলায় স্কুলবোর্ডগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে দলীয় ব্যক্তিদের মনোনীত করে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত বোর্ড গঠনের মাধ্যমে দলবাজির চূড়ান্ত রূপ দেখা যায়। এরাই জেলায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করে। সেখানে চলে একদিকে চূড়ান্ত দলবাজি, অন্যদিকে চরম স্বজনপোষণ ও দুর্নীতি। জেলায় জেলায় শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে ফেটে পড়লেও সরকার নির্বিকার থেকে এই হীন কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে নির্বাচনী প্রহসনের মধ্য দিয়ে যে জেলা কাউন্সিল ও রাজ্য বোর্ড গঠন করা হয়েছে — সেখানেও নির্বাচিত প্রতিনিধির তুলনায় মনোনীত ব্যক্তিদের প্রাধান্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। ফলস্বরূপ দলবাজি বন্ধ বা কম হওয়া দূরের কথা — আরও ব্যাপকভাবে ঘটে চলেছে।

যে সিলেবাস কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে প্রাথমিকে ইংরেজি, পাশ-ফেল প্রথা বাতিল করা হয়েছে, সেই সিলেবাস কমিটির চেহারা কী ছিল? ১৯৭৪ সালে কংগ্রেস আমলে গঠিত সিলেবাস কমিটির প্রথম সভা হয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, '৭৭ সালের জুন মাসে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ঐ বছরের ১৩ আগস্ট। কিন্তু ঐ সভায় সরকারের প্রস্তাব মত ইংরেজি, পাশ-ফেল প্রথা তোলার বিরুদ্ধে বি পি টি এ-র প্রতিবাদ এবং তার প্রতি ব্যাপক সমর্থনের আঁচ পেয়ে তড়িঘড়ি এই কমিটিতে আরও বহু দলীয় ব্যক্তিবর্গকে তারা যুক্ত করে এবং ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জনবিরোধী সিদ্ধান্ত পাশ করিয়ে নেয়।

এ সবকিছুই তারা করতে থাকে চরম স্বৈরতান্ত্রিক পথে, অথচ একেই গণতন্ত্র বলে চালাতে থাকে। এইরকম গণতন্ত্রের আরও হাজার নমুনা আছে — যার সাথে গণতন্ত্রের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রাথমিকে শহরাঞ্চলের স্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটি বাতিল করে প্রশাসক নিয়োগ, ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের অধিকার বাতিল — এ সবই তাদের রাজত্বে হয়েছে।

পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছে আরও নগ্ন দলবাজি; পঞ্চায়েত কর্তৃক সমস্ত অধিকার খর্ব করার হীন অপপ্রয়াস। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটির পরিবর্তে অ্যাটেন্ডেন্স কমিটি নাম দিয়ে যে কমিটি গঠনের কথা বলা হয় — সেখানেও পঞ্চায়েতের লোকজনকে দিয়ে এই সমস্ত কমিটি পরিচালনার চেষ্টা হয়। এরাই মাসিক রিটার্নে সই করবেন, তবেই শিক্ষকদের বেতন হবে। অর্থাৎ শিক্ষকদের অ্যাটেন্ডেন্স (উপস্থিতি) ঠিকমতো আছে কিনা — তা দেখার দায়িত্ব এদের। এরা সার্টিফিকেট দিলে তবে প্রমাণ হবে উপস্থিতি ঠিক আছে। দেখা গেছে দিনের পর দিন স্কুলে না এসেও এদের সার্টিফিকেটে অনেকে প্রতিদিন উপস্থিত ও বেতন পাবার যোগ্যতা লাভ করেছেন। বলা বাহুল্য, কারা এই সৌভাগ্যবান! আর যদি কেউ অন্য মতাবলম্বী হন তাহলে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে ঠিকমত কাজ করা সত্ত্বেও তাঁদের হয়রানি করার বহু অভিযোগ শোনা যায়।

পঞ্চায়েতের হাতে ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে পঞ্চায়েত অফিসে বই পড়ে থাকলেও বই বিতরণ হচ্ছে না। কারণ হিসাবে বহু জায়গায় শোনা গেছে — পঞ্চায়েত কর্তাদের সময় হচ্ছে না। তাঁরা বড়ই ব্যস্ত। তাঁদের সময় হলে তবে তাঁরা স্কুলে স্কুলে সশরীরে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই বিলি করবেন। তাঁদের উপস্থিতি বড় কথা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া বড় কথা নয়। দিনের পর দিন বই না পেয়ে শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হোক, কিন্তু তাঁদের উপস্থিত হয়ে তাঁদের মাহাত্ম্য প্রচারের কাজটি সর্বাগ্রে দরকার। এছাড়াও আরও বহু অভিযোগ আছে। যেমন, বই যা এল তা সমস্ত স্কুলের মোট প্রয়োজনের তুলনায় হয়ত অনেক কম, তখন স্কুল বেছে বেছে বই বিলি করা হবে। রঙ তখন বিবেচ্য বিষয়, শিক্ষা বা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিবেচ্য বিষয় নয়।

সর্বশিক্ষার টাকা আসছে। এই টাকা খরচের তত্ত্বাবধানে থাকবে ভি ই সি, অর্থাৎ ভিলেজ এডুকেশন কমিটি। স্বাভাবিকভাবেই এখানে কাদের প্রাধান্য থাকবে? থাকবে ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের। কীভাবে টাকা খরচ হবে, বিল্ডিং বা ক্লাসরুম কেমন তৈরি হবে, সেগুলি তাদের পছন্দ অনুযায়ী বিবেচনা করতে হবে। এমনও অভিযোগ শোনা গেছে, বিল্ডিং বা ক্লাসরুম তৈরির ক্ষেত্রে পাঠদানের দিকটি প্রধান নয়, মিটিং ইত্যাদি করার পক্ষে কোন্‌টা অনুকূল সেটাই প্রাধান্য পায়। এ'রকম আরও বহু নজির আছে যা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। আমরা দেখেছি, অন্যান্য প্রশাসনিক ব্যবস্থার মত শিক্ষা প্রশাসনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শাসকদলের কুক্ষিগত করার হীন অপপ্রয়াস। তবুও শুধুমাত্র দলের উপর নির্ভর না করে পঞ্চায়েতের উপরে বেশি নির্ভরশীলতা কেন? কারণ এটাই সি পি এমের ভোট ব্যাঙ্ক। গ্রামে গঞ্জে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাই মানুষকে ভুল বোঝানো, প্রলোভন দেখানো, বা ভয়ভীতি দেখিয়ে জোর জুলুম করে তাদের অধীনস্থ করে রাখার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তাই বারেবারে চেষ্টা হয়েছে পঞ্চায়েতকে দিয়ে বিভিন্ন খবরদারির কাজ করানো। বর্তমান অপচেষ্টারও লক্ষ্য সেই একই।

এবার আরও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিধানসভায় বিল পাশ করিয়ে মুখ্যসচিবকে দিয়ে সরকারি আদেশ ইস্যু করে কাজ পাকা করা হয়েছে। বিধানসভায় পাশ হল বলেই কি তা গণতান্ত্রিক হয়ে গেল? সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা কাদের? শাসকদলের বাইরে অন্য কারও কি? নিজেদের খুশিমত বিল পাশ করিয়ে গণতন্ত্রের তক্‌মা এঁটে দিলেই তা গণতান্ত্রিক হয়ে যায় কি? আদৌ তা হয় না।

এখনও গ্রামাঞ্চলে ভোট-ব্যাঙ্ক ধরে রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মত নির্ভরযোগ্য দ্বিতীয় কেউ নেই। তাই এই শিক্ষকরা যাতে সম্পূর্ণভাবে সরকার তথা বৃহৎ শাসকগোষ্ঠীর পদানত থাকে তারই ব্যবস্থা করা হবে। এই উদ্দেশ্যেই এই বিল। পঞ্চায়েতকে দিয়ে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন করা হবে এবং তাদের উপর পঞ্চায়েতকে দিয়েই চার্জশিট দেওয়ার খাঁড়া ঝুলবে। ভয়ে শিক্ষকসমাজ যাতে শাসকগোষ্ঠীর পদলেহন ব্যতীত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে তারই পাকা ব্যবস্থা।

কিন্তু এ কাজ এই সময়ে করা হল কেন? সামনে নির্বাচন। শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে প্রবল জনরোষের প্রতিফলন বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, সেখানে সর্বস্তরের মানুষকে নিজেদের পায়ের তলায় রেখে গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে যেন-তেন-প্রকারেণ নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার হীন অপচেষ্টা। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শিক্ষকদের তাঁরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছেন। কারণ এটা ওরা ভাল করেই বোঝেন যে, যতই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অশালীন ভাষায় গালমন্দ করে জনসমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা হোক না কেন, এখনও জনমনে শিক্ষক সমাজ সম্পর্কে শ্রদ্ধা বিদ্যমান। তাই একদিকে শিক্ষকদের হেয় করার চেষ্টা চালানো হবে — আবার পাশাপাশি যতটুকু তাঁদের দিয়ে সুবিধা আদায় করিয়ে নেওয়া যায় তারও কসুর তাঁরা করবেন না। **এখনও গ্রামাঞ্চলে ভোট-ব্যাঙ্ক ধরে রাখার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের মত নির্ভরযোগ্য দ্বিতীয় কেউ নেই। তাই এই শিক্ষকরা যাতে সম্পূর্ণভাবে সরকার তথা বৃহৎ শাসকগোষ্ঠীর পদানত থাকে তারই ব্যবস্থা করা হবে। এই উদ্দেশ্যেই এই বিল। পঞ্চায়েতকে দিয়ে শিক্ষকদের কাজের মূল্যায়ন করা হবে এবং তাদের উপর পঞ্চায়েতকে দিয়েই চার্জশিট দেওয়ার খাঁড়া ঝুলবে। ভয়ে শিক্ষকসমাজ যাতে শাসকগোষ্ঠীর পদলেহন ব্যতীত মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে তারই পাকা ব্যবস্থা।**

অথচ শিক্ষকদের কাজ দেখার জন্য তো রয়েছে শিক্ষা প্রশাসন। এস আই, ডি আই, কাউন্সিল, ডি এস ই তথা সামগ্রিক শিক্ষাদপ্তর। তাদের কাজ কী? ঠুঁটো জগন্নাথ? এত বড় শিক্ষা প্রশাসন, এত মন্ত্রী সব কিছু মজুত থাকতেও পঞ্চায়েত কেন? কারণ ওরা সরকারি লোক, সরাসরি দলের লোক নয়। আর পঞ্চায়েত মানেই সরাসরি দলীয় লোকজন। তারা সামনে থাকবে, চোখ রাঙাবে, ক্ষমতার বহর দেখিয়ে শায়েস্তা করবে — একেবারে চটজলদি ব্যবস্থা। সামনে ভোট, তাই চটজলদি ব্যবস্থা চাই এবং হাতের সামনে চাই।

অথচ এই চূড়ান্ত দলবাজির কাজটি হাসিল করার জন্য গণতন্ত্রের আবরণ দেওয়ার কতই না হীন প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। বিধানসভায় বিল পাশ, রাজ্যপালের অনুমোদন, মুখ্য সচিবের সরকারি আদেশ ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলির মধ্য দিয়ে এমন ভাব দেখানো হচ্ছে, যেন তাঁরা গণতন্ত্র ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। কিন্তু বাস্তবে স্বৈরতন্ত্রের দিকে যে তাঁরা ধাপে ধাপে অনেক দূর এগিয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। আজ এঁরা জনস্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় বেশি তৎপর। তাই একের পর এক সাধারণ মানুষের স্বার্থ হত্যা করা হচ্ছে, আবার সেই মানুষগুলোকেই ভয়ভীতি দেখিয়ে এবং নানা বিভ্রান্তিকর প্রচারের মধ্য দিয়ে তাদের পিছনে রেখে কাজ হাসিল করার চেষ্টা চলছে। বামপন্থার নামে এ চরম কলঙ্ক। শিক্ষকসমাজ তাদের এই হীন চক্রান্তের শিকার। আজ শিক্ষক সমাজকে সবচেয়ে বেশি অসম্মান যদি কেউ করে থাকে তা করেছে এই সরকার। এঁরা বলেন, শিক্ষকদের নাকি তাঁরা এত বেতন বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা অতীতে কেউ করেনি এবং ভূ-ভারতে এর নাকি কোন নজির নেই। কিন্তু টাকার অঙ্কে বেতন কিছু বাড়লেও, একথা কি সত্য নয় যে তা বেড়েছে সমস্ত অংশের চাকুরিজীবী মানুষেরই। তাহলে শুধু শিক্ষকদের বেলায় তা খাটে কি? পক্ষান্তরে যা বলা যায়, শিক্ষকদের পাঁচ বছর চাকরি কমানো, পি এফ-এর কন্ট্রিবিউটরি অংশের কোটি কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা, হাজার হাজার শিক্ষকপদ শূন্য রেখে অর্থ বাঁচানো ও শিক্ষার সর্বনাশ করা, হাজার হাজার শিক্ষককে পেনশন না দিয়ে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া ইত্যাদি কাজ এঁরা করেননি? যা তারা দিয়েছেন তা দয়ার দান নয়, শিক্ষকদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পাওয়া ন্যায্য অধিকার।

অন্যদিকে, সম্মানের কথা না বলাই ভালো। প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত শিক্ষকসমাজ সম্পর্কে এত শ্রদ্ধার বাণী তারা ছড়িয়েছেন এবং ছড়াচ্ছেন যা আজ দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও লজ্জা দেয়। শিক্ষকরা লোভী, অসৎ, মানসিক প্রতিবন্ধী, শিক্ষকরা ফাঁকিবাজ ইত্যাদি নানা বাণী সংবাদপত্র ও মিডিয়ায় তারা ছড়িয়েছেন। এগুলি কেমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন? তাই এদের মুখে শিক্ষকসমাজ সম্পর্কে শ্রদ্ধার কথা শুনলে মানুষ আঁতকে উঠবে।

আজ এটা সুস্পষ্টভাবে বলা ভাল, এই সরকার সাধারণ স্তরের কোন অংশের শ্রমজীবী, বুদ্ধিজীবী মানুষের ভাল চায় না। এদের উদ্দেশ্য শুধু নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থ হাসিল করা এবং সেই উদ্দেশ্যেই পঞ্চায়েতের হাতে এই ক্ষমতা প্রদানের ষড়যন্ত্র। তাই আজ প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষককে আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা, সম্ভ্রমবোধ এবং স্বাধীনতার রক্ষার্থে সরকারের এই হীন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করলে আরও বড় আন্দোলন

তিনের পাতার পর

সরকারের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। অনশনের দ্বিতীয় দিনে অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থা ক্রমাগত খারাপ হতে থাকলে সরকারের ওপর চাপ আরও বাড়তে থাকে। মেদিনীপুর জেলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির সম্পাদক ৬৫ বছরের মধুসূদন মান্না গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে পুলিশ জোর করে তাকে এস এস কে এম হাসপাতালে নিয়ে যায়। তৃতীয় দিনে আরও ৮০ জন অনশনকারী অসুস্থ হয়ে পড়েন। আন্দোলনের মঞ্চ থেকে ক্রমাগত ঘোষণা হতে থাকে, প্রাণ দিয়েও এই আন্দোলন চলবে। প্রশাসন ধাক্কা খেতে শুরু করে। পুলিশ মারফৎ খবর যায়। দেখা গেল, হঠাৎ মেডিকেল কলেজের ডেপুটি সুপার একটি মেডিকেল টিম নিয়ে অনশনস্থলে এলেন অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য, মৃত্যু আটকাবার জন্য। তিনি ১০ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে ঘোষণা করেন। অ্যাবেকা'র নিজস্ব চিকিৎসক টীমও ২৪ ঘণ্টা ক্যাম্পে ছিল, তাঁরাও নিয়মিত অনশনকারীদের পরীক্ষা করে গিয়েছেন। তৃতীয় দিনে তাঁরা করেছেন। সিপিএম দলের বেশ কিছু সদস্য এবং পদাধিকারী তাঁদের বক্তৃতায় জানিয়েছেন, নেতৃত্বের জনবিরোধী কার্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ হয়েই তাঁরা বাঁচার তাগিদে অ্যাবেকা'র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছেন।

ইতিমধ্যে রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী তরুণ সান্যাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, নবনীতা দেবসেন, তাপস সেন, মানিক মুখার্জী প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে অ্যাবেকার সাথে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেবার জন্য আবেদন জানিয়ে বলেন, ''বিদ্যুৎগ্রাহকেরা ৩ দিন ধরে অনশন করছেন, কিন্তু এখনও সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি জেনে আমরা দুঃখিত ও চিন্তিত।'' পাশাপাশি ছাত্র, যুব, মহিলা সহ শ্রমজীবী বিভিন্ন অংশের মানুষ প্রতিদিন অনশনস্থলে আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছেন। ৪ জানুয়ারি স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে মিছিল করে অনশনস্থলে যান।

৫ তারিখ মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস, মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন এস টি ই এ, প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন বি পি টি এ, ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়), কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর্মচারীদের সংগঠন জে পি এ নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখা হয়। ৬ জানুয়ারি ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, কে কে এম এস এবং ডি ওয়াই ও'র পক্ষ থেকে মিছিল করে গিয়ে সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। আমৃত্যু অনশনের ঘোষণায় উদ্বেল 'চারণিক' নাট্যগোষ্ঠী অনশনকারীদের সামনে নাটক পরিবেশন করেন, প্রবীণ সংগীতশিল্পী প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, প্রতুল মুখোপাধ্যায় সহ অনেকেই সংগীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে তাঁদের সংহতিজ্ঞাপন করেন, প্রখ্যাত শিল্পী অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে নবীন শিল্পীরা খোলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি এঁকে আন্দোলনের প্রতি তাঁদের সংবেদনশীলতা প্রকাশ করেন।

গোটা রাজ্যজুড়েই অনশনের সমর্থনে চলতে থাকে মিছিল, প্রচার, পথসভা। পথে-ঘাটে, ট্রামে-বাসে মানুষ আলোচনা করতে থাকেন অনশনকারীদের শারীরিক অবস্থা নিয়ে, পাশাপাশি সরকারের চরম অগণতান্ত্রিক আচরণের প্রতি তীব্র নিন্দা ঝরে পড়ে তাঁদের বক্তব্যে। সিপিএম দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও সরকারের আচরণ নিয়ে সমালোচনা ওঠে, পাড়ায় পাড়ায় সিপিএমের কর্মীরা অ্যাবেকার আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান। কৃষকদের পক্ষে এই বর্ধিত মাশুল দেওয়া যে অসম্ভব এবং কৃষিবিদ্যুৎ মাশুলে সরকারি ভরতুকির দাবি যে অত্যন্ত ন্যায্য, একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। উদ্ধত সরকার বোঝে, শুধু পুলিশ দিয়ে এই আন্দোলন ভাঙা যাবে না; এই দাবিতে গ্রাম বাংলায় আগুন জ্বলবে। কিন্তু তখনও সরকার সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব দেয়নি। সরকারের পক্ষ থেকে প্রথমে পুলিশ কমিশনারের সাথে আলোচনার জন্য বলা হয়, যা সরাসরি নাকচ করে দেন আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। পরে স্বরাষ্ট্র সচিবের সাথে আলোচনার প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করা হয়। এরপর মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাব দেন অনশন তুলে নিলে তিনি আলোচনায় বসবেন। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ জানান, তাঁরা দাবি আদায়ের জন্যই অনশনে বসেছেন, একমাত্র দাবি মানার পরই তাঁরা অনশন তুলবেন। আন্দোলনকারীদের এই অনমনীয় এবং আপসহীন মানসিকতাই মুখ্যমন্ত্রীকে শেষপর্যন্ত আলোচনায় বসতে বাধ্য করে। তিনি নিঃশর্ত আলোচনায় বসতে রাজি হন এবং ৬ জানুয়ারি বেলা সাড়ে বারোটায় বসবেন বলে জানিয়ে দেন। সেই অনুযায়ী অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস এবং সভাপতি ভবেশ গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে আটজনের এক প্রতিনিধিদল রাইটার্স বিল্ডিং-এ মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় বসেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে অন্যান্য দাবির সাথে কৃষি বিদ্যুতে ১২০০ কোটি টাকা ভরতুকি দাবি করা হয় এবং ৩ একর পর্যন্ত বিনা মাশুলে বিদ্যুৎ এবং বাকিদের ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেওয়ার দাবি করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী কৃষিবিদ্যুতে সরকারের ভরতুকি দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মতি দেন। কিন্তু কী পরিমাণ দেওয়া হবে তা অর্থমন্ত্রী, বিদ্যুৎমন্ত্রী এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ৭ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে সল্টলেকে গ্রাহকদের উপর পুলিশি অত্যাচার ও গুলিচালনার ম্যাজিস্ট্রেট স্তরের তদন্ত ঘোষণা করেন। গুলিবিদ্ধ খুদ্দার সেখকে ২৫০০০ টাকা এবং অন্যান্য আহতদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেন। যে সমস্ত বিদ্যুৎগ্রাহক দীর্ঘ কয়েকমাস ধরে বিদ্যুৎ বিল বয়কট চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের লাইন না কাটা, ফাইন না নেওয়া, এবং যাঁদের লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে তাঁদের লাইন নিঃশর্তে জুড়ে দেওয়ারও তিনি নির্দেশ দেন। এরপর তিনি অনশনকারীদের অনশন প্রত্যাহার করার আবেদন জানান। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর অনশনকারীরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন, মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ৬ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় অনশন প্রত্যাহার করা হবে। সেইমতো অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সঞ্জিত বিশ্বাস অনশন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন, ৭ দিনের মধ্যে যদি মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করেন, তবে আটদিনের মাথায় পুনরায় আরও জোরদার আন্দোলন শুরু হবে। তিনি একথাও বলেন যে, প্রয়োজনে রাজ্যব্যাপী বোরো চাষ বন্ধের ডাক দিতে হবে এবং সেকারণে খাদ্যসঙ্কট দেখা দিলে তার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে। তিনি আরও বলেন, দাবি যথাযথভাবে পূরণ না হলে আবারও আরও বড় আকারে অনশন আন্দোলন হবে।

মুখ্যমন্ত্রী কী কী দাবি এখনই মেনে নিয়েছেন, কোন্ দাবি পূরণের নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন — সেকথা যখন মঞ্চ থেকে ঘোষিত হচ্ছে, উপস্থিত অনশনকারী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ও জনতার মধ্যে আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়, মুহুর্মুহু হাততালিতে সচকিত হয়ে ওঠে ধর্মতলা অঞ্চল। অনশনস্থলে তখন উপস্থিত হয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের পূর্বতন বিচারপতি অবনী মোহন সিন্‌হা, বিশিষ্ট পরিবেশবিদ চির দত্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শক্তিবিষয়ক গবেষণার অধ্যাপক সুজয় বসু ও জননেতা মানিক মুখার্জী। তাঁরা এসপ্ল্যানেডের টিপু সুলতান মসজিদের কর্মকর্তাদের সহমর্মিতার নিদর্শন হিসাবে পাঠানো সরবৎ অনশনকারীদের হাতে তুলে দিয়ে অনশন ভঙ্গ করান। ৪ দিন ধরে অনশনের বেহাল শরীরের শ্রান্তি যেন কোথায় চলে গিয়েছে। প্রবীণ ও নবীন কৃষকদের মুখে একটাই কথা — ''এ আমাদের মরণ-বাঁচনের লড়াই, হয় জিতব, না হয় মরব।'' অনশন শিবিরের সামনে স্থির হয়ে থাকা শহীদ যতীন দাসের ছবিটি তখন রাস্তার আলোয় জ্বলজ্বল করছে।

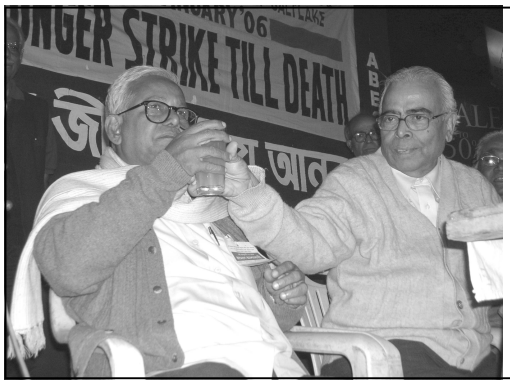

সঞ্জিত বিশ্বাসকে অনশন ভাঙাচ্ছেন বিচারপতি অবনীমোহন সিন্‌হা। (ডাইনে) কৃষকদের অনশন ভাঙাচ্ছেন জননেতা মানিক মুখার্জী।

জানালেন অনেকের প্রস্রাবে কিটোনবডি পাওয়া যাচ্ছে, যা ভাল লক্ষণ নয়। বিশাল পুলিশবাহিনী এসে তাঁদের জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলে অনশনকারীরা পুলিশের জবরদস্তি মেনে নিলেন না। তাঁরা স্লোগান দিতে থাকেন, ''পুলিশ গো ব্যাক।'' দেখা গেল অনশনকারীদের মধ্যে একজন এক পুলিশ অফিসারকে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ''আপনারা সল্টলেকে বর্বরের মতো মারলেন, গুলি করলেন, তারপর গুলি চালাননি এই অসত্য কথা বললেন। আপনাদের মতো মিথ্যেবাদীদের সাথে হাসপাতালে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'' তমলুক থেকে আসা ৬৫ বছরের এক কৃষক বললেন, ''জনসংখ্যার ৯০ ভাগই কৃষক, অথচ সরকার কৃষকদের স্বার্থই দেখছে না।'' তিনি আরও বললেন, ''আমি এখনও সিপিআই দল করি। পাঁচের দশক, ছয়ের দশকের আন্দোলনে আমি থেকেছি। অনশন থেকে অনেকেই আমাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু এই আন্দোলনকে আমি নীতিগতভাবে সঠিক মনে করেই এসেছি। মরতে যদি হয় এখানেই মরবো, হাসপাতালে গিয়ে মরবো না।'' শেষপর্যন্ত পুলিশ টেনেহিঁচড়ে ৭ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু হাসপাতালে গিয়েও তাঁরা চিকিৎসা নিতে অস্বীকার করেন। চিকিৎসকদের বলেছেন, ''ধন্যবাদ আপনাদের, আমাদের চিকিৎসার প্রয়োজন নেই, আপনারা সরকারকে বলুন আমাদের দাবি মেনে নিতে।''

তিনদিন-চারদিন ধরে অনশনরত অসুস্থ চাষীরাও একের পর এক মঞ্চে উঠে সরল গ্রাম্যভাষায় তাঁদের মরণপণ দৃঢ়তা প্রকাশ

কমরেড প্রভাস ঘোষের অভিনন্দন

এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ৬ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

''মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক চাষীদের বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর প্রতিশ্রুতি, সল্টলেকে পুলিশি আক্রমণের তদন্ত করানো, গুলিবিদ্ধ যুবককে ক্ষতিপূরণ দান ও চিকিৎসার সরকারি দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি দাবি মেনে নেওয়া পুনরায় প্রমাণ করল যে, একমাত্র সুসংগঠিত, বলিষ্ঠ ও লাগাতার গণআন্দোলনের দ্বারাই সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা যায়।

''এই গুরুত্বপূর্ণ জয়ের জন্য আমরা আন্দোলনকারী গরিব কৃষকদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।''

বীরভূমের লাভপুর থেকে এসেছেন ৭৪ বছরের চাষী অনাদি কিঙ্কর মণ্ডল। চারদিন জলস্পর্শ করেননি তিনি। পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য জোর করলে তিনি দৃঢ়তার সাথে জানিয়ে দেন, ''আমাকে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে, ধর্মতলার মোড়ে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করব।'' এই দৃঢ়তার কাছে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয় পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গ পুর আইন লঙ্ঘন করে সিপিএম সরকার জঞ্জাল কর বসাচ্ছে

পশ্চিমবাংলার পুর উন্নয়নের জন্য ঘুম নেই বিশ্বব্যাঙ্কের চোখে। তাই তাদেরই বকলমে ব্রিটিশ সরকারের একটি আর্থিক সংস্থা ডি এফ আই ডি (ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট) পশ্চিমবঙ্গের ১২৪টি পুর এবং ৩টি কর্পোরেশন এলাকার জন্য ৭১৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে এবং ২০০২ সাল থেকে সেই অনুদান দিতেও শুরু করেছে (সম্পাদকীয়, বর্তমান, ৩০-১২-২০০৫)। এই অনুদান আসলে ঋণ; সুদ সহ এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং এই ঋণদানও শর্তসাপেক্ষ। সেই শর্ত অনুযায়ী পৌরএলাকার সকল নাগরিকের থেকে জলসরবরাহ, নিকাশি, জঞ্জাল অপসারণ ইত্যাদি পরিষেবার জন্য পুরকর্তৃপক্ষকে আলাদা আলাদাভাবে কর আদায় করতে হবে।

সিপিএম সরকার এবং সেই সরকারের মন্ত্রীরা প্রায়শই জোর গলায় বলেন যে, দক্ষিণপন্থী সরকারের মতো তাদের সরকার বিদেশি ঋণদাতা সংস্থাগুলির শর্তের কাছে মাথা নত করে না, ঐ সংস্থাগুলি তাদের সরকারের শর্তেই ঋণ দেয়। এ এক ডাহা মিথ্যাচার! ঋণদাতা নাকি ঋণগ্রহীতার শর্তে ঋণ দেয়! এবং এই কথা রাজ্যবাসীকে বিশ্বাস করতে হবে! বাস্তবে ডি এফ আই ডি ৭১৫ কোটি টাকা ঋণ দিচ্ছে এবং সেজন্য জনবিরোধী যেসব শর্ত আরোপ করছে, এই সরকার সেইসব জনবিরোধী শর্ত নিঃশব্দে মেনে চলেছে। রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য গত আগস্টেই গেয়ে রেখেছেন, ''প্রথম বছর যেহেতু আমরা টাকাটায় জঞ্জাল সাফাইয়ের সরঞ্জাম কিনতে বলেছি, তাই এবছর পুরসভাগুলিকে জঞ্জাল কর সংগ্রহ করতে বলা হবে না। কারণ, আগে নাগরিকরা পরিষেবা পাক, তবে তো মূল্য দেবার প্রশ্ন ওঠে'' (সংবাদ প্রতিদিন ৩১-৮-০৫)। অর্থাৎ তারা জঞ্জাল কর চাপাবেনই, তবে একটু দেরিতে। কিন্তু সিপিএম চালিত দক্ষিণ ২৪ পরগণার রাজপুর-সোনারপুর পৌর কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই জঞ্জাল সাফাই সারচার্জ বা কর চালু করে দিয়েছে। বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে পুর বিভাগের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ করানোর জন্য তারা হোল্ডিং পিছু মাসে কোথাও ১৫ টাকা, আবার কোথাও ২০ টাকা এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের উপর ৫০ টাকা হারে কর ধার্য করেছে। আগামী বিধানসভা নির্বাচন মিটলেই কলকাতা-ঘেঁষা হুগলি শিল্পাঞ্চলের উত্তরপাড়া-কোতরং, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর ও বৈদ্যবাটি — এই পাঁচটি পুরসভায় হোল্ডিং পিছু মাসে ১৫ টাকা হারে জঞ্জাল কর আদায়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি কলকাতায় কে এম ডি এ-র প্রশাসনিক ভবনে এক বৈঠকে পাঁচ পুরসভার কর্তাদের ডেকে এই প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে (সূত্র ঃ বর্তমান, ৮-১২-০৫)।

রাজপুর-সোনারপুর পুরসভা এলাকার সাধারণ মানুষ ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন। এস ইউ সি আই-এর এক প্রতিনিধিদল পুর-চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে প্রতিবাদী স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন। গড়ে উঠেছে নাগরিক ঐক্যমঞ্চ। পুর-চেয়ারম্যানের কাছে তারা প্রতিবাদ পত্র পেশ করে দেখিয়েছে যে, ডি এফ আই ডি'র নির্দেশে নাগরিকদের উপর নতুন করে এই জঞ্জাল কর চাপানো অন্যায়, অযৌক্তিক ও বেআইনি। বঙ্গীয় পৌর আইনে (The W.B. Municipal Act) সুনির্দিষ্ট করে বলা আছে যে, জঞ্জাল সাফাই, নিকাশি ব্যবস্থা বা জল সরবরাহের মতো আবশ্যিক নাগরিক পরিষেবা জোগানো পৌরসভার অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য (obligatory functions)। নাগরিকরা সরকারকে যেমন সম্পত্তি কর দেয়, তেমনি এইসব নাগরিক পরিষেবা পাওয়ার জন্য তারা পুরসভাকে জোগায় পুরকর বা হোল্ডিং কর। নাগরিকরা হোল্ডিং করও দেবে, আবার জঞ্জাল পরিষ্কারের জন্য, জল সরবরাহ বা নিকাশির জন্যও আলাদা আলাদাভাবে কর দেবে — এতো চলতে পারে না। একই কাজের জন্য নাগরিকদের থেকে দু'বার কর আদায় — এ কোন্ গণতান্ত্রিক রীতি! এ তো ঘোরতর অনৈতিক, আইন বিরুদ্ধ এবং নাগরিকদের উপর অন্যায় আক্রমণ।

বিশ্বায়নের নামে যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বময় আস্ফালন করে চলেছে — এ হল তারই ফতোয়া। সেই ফতোয়াকে কার্যকরী করছে সিপিএম সরকার। তারা পুরসভার জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ সাফাই বিভাগের হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে বেসরকারি এজেন্সির হাতে তুলে দিচ্ছে এবং সেটাকেই অজুহাত করে জঞ্জাল কর নতুন করে চাপাচ্ছে। বাস্তবে পুরসভার এই পদক্ষেপও আইনবিরুদ্ধ। বঙ্গীয় পৌর আইনের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৬৩(২) ধারায় বলা আছে, নাগরিক স্বার্থে এই 'অবশ্যপালনীয় কাজ' যদি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা করাতে হয় তাহলেও আইনে বর্ণিত 'অবশ্যপালনীয় কাজ' বা দায়িত্ব থেকে পুরসভা অব্যাহতি পেতে পারে না। অর্থাৎ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে পরিষেবার কাজ করালেও তার আর্থিক দায়দায়িত্ব পুরসভার — নাগরিকদের নয়। নাগরিকরা সেজন্য নতুন করে কর বহন করবে না। পুরকরের মধ্যেই তাদের সমস্ত পরিষেবা কর দেওয়া আছে।

এই পদক্ষেপের মধ্যে আর একটি বিপজ্জনক দিকও আছে, তাহল — বেসরকারীকরণ। সরকার যেমন হাসপাতাল সহ সরকারি সকল ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঙ্ক তথা সাম্রাজ্যবাদ নির্দেশিত বেসরকারীকরণ করছে, সকল পরিষেবাকেই ঠিকা শ্রমিক, ঠিকা শিক্ষক, ঠিকা ডাক্তার-নার্স নির্ভর করে তুলছে, ঠিক তেমনি পুরসভার প্রতিটি বিভাগের কাজকর্মকেও তারা ঠিকা শ্রমিকের হাতে তুলে দিতে চলেছে। পরিণামে পুরসভার ঐসব বিভাগ কার্যত উঠে যাবে, বিভাগীয় শ্রমিক-কর্মচারীদের চাকরি চলে যাবে, চাকরির পদগুলোও অবলুপ্ত করে দেওয়া হবে। রাজপুর-সোনারপুর পুর- চেয়ারম্যান যুক্তি দিয়েছেন, এজেন্সির হাতে জঞ্জাল সাফাই-এর দায়িত্ব দেওয়ায় কিছু বেকার ছেলে তো কাজ পেয়েছে। কিন্তু বাস্তবে কর্তৃপক্ষ যদি কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সত্যিই আন্তরিক হত তবে ডিপার্টমেন্টের কাজ সরিয়ে নিয়ে তারা বাইরের এজেন্সির হাতে দিত না। বর্তমানে যারা পুর-সাফাই কর্মী, তাদের যখন নিয়োগ করা হয়েছিল তখন পুরসভায় ছিল মাত্র ১৪টি ওয়ার্ড। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরও নতুন ১৯টি ওয়ার্ড। ৩৩টি ওয়ার্ডের নাগরিকদের থেকেই কর্তৃপক্ষ পুরকর আদায় করে চলেছে। তাহলে এই সংযুক্তির পরে তো আরও সাফাই-কর্মী নিয়োগ করার প্রয়োজন ছিল। সেটা করা হলে আরও ২০/২৫ জন বেকার স্থায়ী কাজ পেতেন। কর্তৃপক্ষ তা কিন্তু করেনি। শুধু তাই নয়, যেসব পুরকর্মী মারা গেছেন এবং অবসর নিয়েছেন, সেই শূন্যপদগুলিও পূরণ করা হয়নি। ৪০ জন কর্মচারীর চাকরি স্থায়ীকরণের ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করেনি।

কর্মসংস্থানের সুযোগ ধ্বংস করে, শূন্যপদ পূরণ না করে বেসরকারি এজেন্সির হাতে বিভাগীয় কাজ তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে যারা লিপ্ত সেই পৌর কর্তৃপক্ষ নতুন কর্মসংস্থান করার বাণী দিচ্ছে, এর চেয়ে বড় ধাপ্পা আর কী আছে! বেসরকারি এজেন্সির যে কর্মীদের প্রতি তারা দরদের কথা শোনাচ্ছে, সেই কর্মীরা কতটুকু মজুরি হাতে পান — পুর- কর্তৃপক্ষ কি তার খোঁজ রাখে? এঁদের নামমাত্র মজুরিতে খাটিয়ে এঁদের নিয়োগকারী এজেন্সি বিপুল মুনাফা লোটে এবং লুটবে। পুর-কর্তৃপক্ষ তথা সিপিএম সরকার বেসরকারীকরণ পদক্ষেপের দ্বারা সেই ব্যবস্থাই তো গ্রহণ করছে।

নাগরিকদের মনে রাখতে হবে, পুরসভাগুলি অতিরিক্ত জঞ্জাল কর চাপানো দিয়ে শুরু করছে মাত্র; গণপ্রতিবাদ যদি ব্যাপকতা নিয়ে গড়ে না ওঠে, প্রতিরোধের প্রাচীর যদি দ্রুত খাড়া করা না যায়, জঞ্জাল কর যদি প্রতিরোধ করা না হয় তবে এই পথ বেয়েই একে একে আলাদাভাবে জলসরবরাহ কর, নিকাশি কর ইত্যাদি নাগরিকদের ঘাড়ে অন্যায় ও বেআইনিভাবে চাপানো হবে। ডি এফ আই ডি'র থেকে এইসব কর চাপানোর শর্তেই রাজ্য সরকার ৭১৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে। এটা চাপানোর জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। শুধু এখানেই তারা থেমে থাকবে না, উপর্যুপরি আরও নানান অর্থনৈতিক আক্রমণ তারা হানতে থাকবে। ইতিমধ্যেই শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন সহ সমস্ত পরিষেবা ক্ষেত্রেই তারা বেসরকারীকরণ চাপিয়ে দিয়েছে, পরিষেবা ক্ষেত্রকে লাভজনক করে তোলার নামে ব্যয়বহুল করে তুলেছে। নানা কর তারা বৃদ্ধি করেছে বিপুল হারে। পুলিশ-প্রশাসন-সরকার-সরকারি রাজনৈতিক দল, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার — সব সংঘবদ্ধ হয়ে নাগরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় নাগরিকরা কি একা একা বাঁচার চেষ্টা করলে বাঁচতে পারেন? ভোটসর্বস্ব পার্টিগুলোর নেতাদের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস নিয়ে থাকলে কি তাঁরা রেহাই পাবেন, যদি দলমত নির্বিশেষে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে না তোলেন? রাজপুর-সোনারপুরের নাগরিকরা সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একে আরও দৃঢ়বদ্ধ করে আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গড়ে তুলে প্রতিরোধের পথে এগোলে তবেই তাঁরা সুফল পাবেন। হুগলির পাঁচটি পুরসভা সহ পশ্চিমবাংলার সকল পুরসভা ও কর্পোরেশন এলাকার নাগরিকদের 'বিধানসভা ভোট চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে' জাতীয় মানসিকতা পরিত্যাগ করে এখনি সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ আন্দোলনে নেমে পড়তে হবে। ভোট আসবে, চলে যাবে, সেখানে থাকে নেতাদের উজির-নাজির হওয়ার প্রশ্ন। কিন্তু প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গে নাগরিকদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। তাই এখনি নামতে হবে। হুগলির ৫টি পুরসভা যেখানে ভোটের পর জঞ্জাল কর চাপানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেখানে নাগরিকদেরও এখনি প্রস্তুতি নিতে হবে সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য। কেননা, ভোটের পরপরই জঞ্জাল কর চাপানো হবে। তখন রোখা হবে কী করে, যদি অগ্রিম প্রস্তুতি গড়ে তোলা না যায়!

মদের ভাটি উচ্ছেদে পুরুলিয়ায় মা-বোনেদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যের সর্বত্র নির্বিচারে মদের লাইসেন্স বিতরণ করে চলেছে। তবে সরকার চাইলেই যে তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে নেওয়া পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারে না, বরং সংগঠিত জনমত সরকারের এই ঘৃণ্য নীতিকে পর্যুদস্ত করে দিতে পারে — এরই প্রমাণ পাওয়া গেল পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে ২২নং ওয়ার্ডের কাটিন পাড়া এলাকায় মদের ভাটি উচ্ছেদে মা-বোনেদের দৃঢ় সংগ্রামে। এই এলাকায় গত অক্টোবর মাসে সরকারি লাইসেন্স পেয়ে জনৈক ব্যক্তি মদের দোকান খুলতে গেলে এলাকার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এলাকাটিতে যেসব মানুষ থাকেন তার একটা বড় অংশ রিক্শা, ঠেলা চালিয়ে বা দিন-মজুরি করে সংসার চালান। এইসব গরিব শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে তাদের বাড়ির মেয়েরা নিজেদের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে সহজেই বুঝতে পারেন এলাকায় মদের দোকান থাকলে তাঁদের চরম সর্বনাশ হবে।

মদের দোকান তুলে দেওয়ার দাবিতে এলাকার লোকজন মদের দোকানের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। মালিক তাদের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দেয়। পুলিশ বেছে বেছে কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে নানা কেস দিয়ে দেয়। পুরুলিয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান এলাকায় গিয়ে মানুষের ক্ষোভের কথা জানতে পেরে বিষয়টি উপযুক্ত জায়গায় আলোচনার আশ্বাস দিলেও কার্যকরী কিছু করেননি। পুলিশ-প্রশাসনের সহায়তায় মদের দোকান চলতে থাকে। খবর পেয়ে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে শোভা মাহাত, সীমা শীট প্রমুখ এলাকায় ছুটে যান। তারা এলাকার মানুষজনকে সংগঠিত করেন, বিশেষ করে মা-বোনেরা মদভাটি উচ্ছেদ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেন। প্রাথমিকভাবে মদ দোকানের সামনে মহিলাদের পিকেটিং শুরু হয়।

প্রতিদিন রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত এই শীতের কামড় উপেক্ষা করে মা-বোনেরা পিকেটিং-এর কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকেন। পুলিশ এবং মালিকের পোষা গুণ্ডারা তাদের ভয় দেখিয়েও নিরস্ত করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত মালিক পিছু হটে এবং মদের দোকান বন্ধ করে পালিয়ে যায়। মদের দোকান উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত মহিলারা পিকেটিং এবং আন্দোলনের অন্যান্য কর্মসূচি চালিয়ে যান।

গত ২০ ডিসেম্বর তিন শতাধিক মহিলা কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার পরও কাজ না হওয়ায় ২৬ ডিসেম্বর পাঁচ শতাধিক মহিলা আবার মিছিল করে জেলাশাসকের কাছে মদের ভাটি বন্ধের দাবি জানান। জেলাশাসক অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

কিউবায় ডব্লু এফ টি ইউ'র সম্মেলনে

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রতিনিধিত্ব করলেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ্ ট্রেড ইউনিয়ন-এর (ডব্লু এফ টি ইউ) পঞ্চদশ সম্মেলন গত ১ থেকে ৪ ডিসেম্বর কিউবার হাভানায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর সভাপতি কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী এই সম্মেলনে যোগ দেন। ৭৭টি দেশের ২২০টি শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সর্বমোট ৫৬৮ জন প্রতিনিধি পর্যবেক্ষক এই সম্মেলনে অংশ নেন। বিদায়ী সভাপতি কমরেড কে এল মহেন্দ্র ছাড়াও, কিউবান ট্রেড কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড পেড্রো রসও সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ২ ও ৩ ডিসেম্বর চারটি অধিবেশনে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা তাঁদের মতামত পেশ করেন। ৪ ডিসেম্বর শেষ অধিবেশনে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নানা বিষয় নিয়ে ২৮টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। উত্তর কোরিয়া, ইরান, সিরিয়া সংক্রান্ত প্রস্তাবের পাশাপাশি মার্কিন সরকার কর্তৃক মিয়ামিতে গ্রেপ্তার করা ৫ জন কিউবান সংগ্রামীকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া সহ ২৮টি প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সম্মেলন থেকে একটি সর্বসম্মত ঘোষণাপত্রও প্রকাশ করা হয়। ডব্লু এফ টি ইউ-র পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন গ্রীসের মাইকেল মাভেরিক, সভাপতি পদটি পেয়েছে সিরিয়া।

৩ ডিসেম্বর প্রতিনিধি অধিবেশনে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন, ডব্লু এফ টি ইউ-র পঞ্চদশ কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে, আমার সংগঠন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পক্ষ থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সম্মেলন যেহেতু হাভানার মতো সংগ্রামী ঐতিহ্যবাহী শহরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তাই এই উপলক্ষে আমি কিউবার সেই বীর সংগ্রামীদের বিপ্লবী অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা ৪৫ বছরের আর্থিক অবরোধ ও মার্কিন যুদ্ধবাজদের নিরন্তর হুমকি সত্ত্বেও, কমরেড ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে সকল প্রতিকূলতা ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের দিনে বিশ্বের সকল প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিগুলির কাছে কিউবার জনগণের এই সংগ্রাম যথার্থই এক জীবন্ত প্রেরণা।

আজ কীরকম সঙ্কটময় বিশ্বপরিস্থিতিতে ডব্লু এফ টি ইউ'র পঞ্চদশ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তা আপনারা জানেন। আধুনিক শোধনবাদীদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পূর্ব ইউরোপের পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতন ঘটার পর, শান্তি, প্রগতি ও বিপ্লবের শক্তিগুলি সাময়িকভাবে হলেও, যথেষ্ট দুর্বল হয়ে গেছে। এর ফলে যুদ্ধ, প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লবের শক্তিগুলি প্রাধান্য পাচ্ছে এবং শ্রমিক আন্দোলনের বর্তমান দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কী উন্নত, কী উন্নয়নশীল, সকল পুঁজিবাদী দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী, কেবল শ্রমিকশ্রেণীর উপরই নয়, সকল অংশের মেহনতি জনগণের উপরই আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের সকল দেশের সচেতন সর্বহারারা নিশ্চয়ই তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ইতিমধ্যে এই নিষ্ঠুর বাস্তবকে উপলব্ধি করছেন যে, বুর্জোয়া মতাদর্শবাদীরা যতই রঙীন ছবি আঁকুক না কেন, বিশ্বায়নের নীতি আসলে শ্রমজীবী জনগণের আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক সকল ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক স্তরে এক ভয়াবহ বর্বর আক্রমণ — যার হাত থেকে বিশ্বের কোনও দেশের মেহনতি জনগণের, এমনকী সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী বিশ্বের শিরোমণি আমেরিকার জনগণেরও রেহাই নেই। সকল প্রতিনিধিদের বক্তব্যেই এসত্য স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বায়নের নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামগুলি সম্পর্কে সকল প্রতিনিধিই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু উন্নত ও তথাকথিত উন্নয়নশীল উভয় দেশগুলিরই একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীগুলিকে কেন আজ বিশ্বায়নের নীতি গ্রহণ করতে হল, এবং কেন যুদ্ধ আজ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি, বিশেষত মার্কিন অর্থনীতির পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন রূপে দেখা দিয়েছে — এই অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ দিকটির প্রতিই আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

একথা সত্য যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিকে ভয়াবহ বলা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু সেটা ছবির একটা দিকমাত্র, অপর একটি দিকও রয়েছে। গত শতাব্দীর একেবারে শুরুতে লেনিন দেখান এবং তৎকালীন ইউরোপের দুর্বলতম দেশ রাশিয়ায় বিপ্লব সফল করার দ্বারা প্রমাণও করেন যে, বিশ্বপুঁজিবাদ বিকাশের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদে পৌঁছাবার পর প্রতিক্রিয়াশীল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেছে এবং বিশ্বে নতুন যুগ, সর্বহারা বিপ্লবের যুগের সূচনা হয়েছে। এসত্য পরবর্তীকালে চীন, ভিয়েতনাম, উত্তর কোরিয়া ও কিউবার সচেতন সর্বহারাশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনগণ বারবার প্রমাণ করেছেন। বীর সোভিয়েট জনগণ ও লাল ফৌজ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি, জাপান, ইটালির ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রকেই কেবল পরাজিত করেছিল তাই নয়, বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদকেও কোণঠাসা ও দুর্বল করে দিয়েছিল। এর পরিণামে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ তৃতীয় তীব্র সাধারণ সঙ্কটের আবর্তে গিয়ে পড়ে, যার থেকে তার মুক্তি অসম্ভব। এই সঙ্কট সমাধান করার জন্য পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা বহুরকম চেষ্টা চালিয়েছে, অর্থনীতির ব্যাপক সামরিকীকরণ ঘটিয়েছে। কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে। আজ সকল সাম্রাজ্যবাদী দেশের, বিশেষত আমেরিকার অর্থনীতি কার্যত যুদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। পুরোপুরি ধ্বংস থেকে অর্থনীতিকে আটকাবার জন্য যুদ্ধ এখন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে পথেও অর্থনীতিকে যেমন ইতিপূর্বে রক্ষা করা যায়নি, এখনও যাবে না। এমনকী, সোভিয়েট ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে পুঁজিবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে ক্রমবর্ধমান সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে পারেনি, বরং তা আরও তীব্র হয়েছে। বিশ্ব পুঁজিবাদ আজ এক চরম মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার মন্দার চেয়েও তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী। সমাজতান্ত্রিক শান্তি শিবির ও সমান্তরাল সমাজতান্ত্রিক বাজারের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী বিশ্বায়নের পথ নিয়েছে এই আশায় যে, এই পথে তারা সঙ্কটের সমাধান করতে পারবে এবং সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের নিজেদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ক্রমাগত তীব্র হচ্ছে, তা দূর করতে সফল হবে। কিন্তু সমস্ত বাস্তব ঘটনাবলী প্রমাণ করছে, পুঁজিবাদের সঙ্কট কিংবা পুঁজিপতিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত কোনটারই বিন্দুমাত্র নিরসন বিশ্বায়ন করতে পারেনি। বরং সঙ্কট আরও বেড়েছে। সকল পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকশ্রেণীগুলি তাদের এই সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য নিপীড়িত জনগণের উপর। এই বিশ্বায়ন নীতির চরম বর্বর চরিত্র ও সকল অংশের মেহনতি জনগণের জীবনে এর ভয়াবহ ফলাফল এবং বিশেষ করে এর বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনের অনুপস্থিতির জন্য আপাতঅর্থে মনে হচ্ছে যে, বিশ্বায়ন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শক্তিরই পরিচায়ক। কিন্তু বাস্তবে বিশ্বায়ন হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতার চিহ্ন ; সম্ভবত এটাই মরণোন্মুখ বিশ্ব পুঁজিবাদের শেষ আক্রমণ। বিশ্বের সকল দেশেই পুঁজিবাদবিরোধী সর্বহারা বিপ্লবের বাস্তব জমি তৈরিই আছে, পুঁজিবাদ এখন কবরের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। কিন্তু আপনাআপনিই তার কবর হবে না, সর্বহারাশ্রেণীকে নিজস্ব বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সচেতনভাবে সংগঠিত হয়ে বিপ্লবের আঘাতে পুঁজিবাদকে খান খান করে দিয়ে কবরে পাঠাতে হবে। কিন্তু সর্বহারা শ্রেণীর সত্যিকারের বিপ্লবী দল আজ অধিকাংশ দেশেই নেই।

একথা সত্য যে, প্রতিটি দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনগণকে মুক্তির পথ সেই দেশের সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দলই দেখাবে। ডব্লু এফ টি ইউ-র সামনে কর্তব্য হচ্ছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শোষিত জনগণের আন্দোলনগুলিকে সংযোজিত ও ঐক্যবদ্ধ করা এবং সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদীদের ভয়ঙ্কর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। আমাদের সংগঠন ভারতের ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর তরফ থেকে আমরা কথা দিচ্ছি, ডব্লু এফ টি ইউ'র এই প্রয়াসে আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহায়তা দেব।

উপস্থিত সকল প্রতিনিধিকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়ে কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী ভাষণ শেষ করেন।

আজকের চীন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের মডেল হল কেন

চীন আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই, একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত — এই সিদ্ধান্ত এস ইউ সি আই গ্রহণ করলেও, কমিউনিস্ট নামধারী সি পি এম নেতৃত্ব সেকথা মনে করেন না। তাঁদের মতে চীনের বর্তমান পার্টি নেতৃত্ব (ঝানু শোধনবাদী তেং শিয়াও পিং-এর উত্তরাধিকারী) 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি' অনুসরণ করে আদতে সমাজতন্ত্রকেই শক্তিশালী করছেন। চীনের এই পথকে তাঁরা নতুন সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বলছেন তাই নয়, চীনের এই 'উন্নয়ন মডেলের' জয়গানে সিপিএম নেতরা মুখর। কেমন সেই উন্নয়ন? চীনের 'সমাজতন্ত্রে' দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের ফুলে ফেঁপে ওঠার রহস্যটাই বা কী? সর্বোপরি, চীনের 'সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতিতে' শ্রমিকরা কেমন আছেন? সমাজতন্ত্র মানে শ্রমিকের শাসন, পুঁজিবাদ মানে পুঁজি তথা পুঁজিপতিদের শাসন। চীনে এখন কোন্‌টা চলছে?

এ ব্যাপারে সম্প্রতি কিছু তথ্য চীনের পার্লামেন্টে পেশ করা রিপোর্টের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

চীনের পার্লামেন্ট বা 'জাতীয় গণপরিষদ'-এর কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত একটি কমিটি সম্প্রতি সেখানকার ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থাগুলিতে কর্মীদের হাল-হকিকত পর্যালোচনা করতে গিয়ে দেখেছে, ৮০ শতাংশ বেসরকারি সংস্থাতেই কর্মীদের কোনও আইনসঙ্গত অধিকারই নেই। এই সংস্থাগুলি কর্মীদের সঙ্গে কোনও চুক্তিই আদতে করে না। ফলে প্রয়োজন হলে নিয়োগকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে ন্যূনতম আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাটুকুও চীনা শ্রমিকদের থাকে না। মালিকের মর্জিমাফিক চলতে না পারলে বিনা বাধায় মালিক তাদের ছাঁটাই করতে পারে ; শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যাপারেও মালিকরা সমস্ত দায়িত্ব ইদানীং ঝেড়ে ফেলে দিয়েছে। এমনকী কাজ চলাকালীন কোনও শ্রমিক দুর্ঘটনায় পড়লে তার দায়টুকুও আজ মালিকরা নেয় না। আহত শ্রমিকটির স্থান হয় ছাঁটাই কর্মীদের তালিকায়। কর্মরত শ্রমিকদের প্রতিই এই যাদের দায় ও দরদবোধের নমুনা, অবসর নেওয়া শ্রমিকদের প্রতি তারা যে কতটা সদয় হবে তা বোঝা দুষ্কর নয়। খুব স্বাভাবিকভাবেই এইসব মালিকরা শ্রমিকদের পেনশন-ফান্ডে কানাকড়িও ঠেকায় না। কমিটি আরও দেখেছে, যে ২০ শতাংশ বেসরকারি সংস্থা কর্মীদের সঙ্গে চুক্তি করে, তারাও অত্যন্ত ধূর্ততার সঙ্গে আইনি দায় এড়াতে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে যায় না; চুক্তির মেয়াদ সর্বদাই এক বছরের নীচে রাখে।

চীনের শ্রম আইনে কিন্তু শ্রমিক-মালিক চুক্তি করার কথা বলা আছে। ১৯৯৫ সালে চালু হওয়া শ্রম আইনে বাধ্যতামূলকভাবে এই চুক্তি করার কথাও বলা হয়েছে। বেসরকারি সংস্থার মালিকরা এ ধরনের চুক্তিতে রাজি না হলে শ্রমদপ্তরকে অধিকারও দেওয়া আছে যাতে তারা যথাযথ চুক্তি করতে মালিকদের বাধ্য করতে পারে। কিন্তু আইন আছে শুধুই খাতায়-কলমে। দুর্নীতিগ্রস্ত অর্থলোভী চীনা প্রশাসনকে দিয়ে এইসব আইন উপেক্ষা করানো মালিকদের পক্ষে আজ কোনও কঠিন কাজই নয়।

চীনের কলে-কারখানায় শ্রমিক জীবনের এই ছবি কী বলে? এ যদি সমাজতন্ত্র হয়, তাহলে পুঁজিবাদ কাকে বলব? মহান নেতা মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে যে বিপ্লবী চীন শ্রমিক কৃষককে শোষণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছিল, যেখানে শ্রমিক মালিকী অত্যাচার বলে কিছু জানত না, ছাঁটাইয়ের কথা ভাবতে পারত না, যেখানে শ্রমিকদের শ্রমের ফসল শ্রমিকরাই ভোগ করত, তা মুনাফা হয়ে মালিকের পকেটস্থ হত না, সেই চীনে আজ এই বর্বর শোষণই প্রমাণ করে, সমাজতান্ত্রিক বাজার অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রের মোড়কে নির্ভেজাল পুঁজিবাদ ছাড়া কিছুই নয়। তাই চীনের শিল্পে আজ দেশি-বিদেশি পুঁজির শোষণের রমরমা। বস্তুত শ্রমিকদের যথেচ্ছ শোষণ করার এই অবাধ সুযোগ ও অধিকারই বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে চীনে — যা পুঁজিপতির মুনাফা বাড়িয়ে শ্রমিককে করছে আরও দরিদ্র। সমাজতন্ত্রের নাম নিয়ে এইভাবে শ্রমিকশোষণের স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করতে পারার জন্যই চীন আজ গোটা বিশ্বের পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের সাধের 'মডেল' হয়ে উঠেছে। ভারতে মনমোহন সিংহেরও মডেল সিপিএমেরও মডেল। কংগ্রেসের শ্রেণীচরিত্র অজানা নয়। বর্তমান পুঁজিবাদী চীনকে 'মডেল' করার দ্বারা সিপিএম নেতৃত্ব নিজেরাই নিজেদের আসল শ্রেণীচরিত্রটি উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

ছাত্রসংসদ নির্বাচনে রঘুনাথপুর কলেজে এ আই ডি এস ও'র জয়

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করল সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। একদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং অন্যদিকে এস এফ আই-এর ভীতি প্রদর্শন, জোর করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানো, টাকার বিনিময়ে ভোট কেনা, ভোটের দিন প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদিকে উপেক্ষা করে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে ১৬টি আসনে এআইডিএসও প্রার্থীদের বিজয়ী করেছে তা এককথায় অভূতপূর্ব। শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ছাত্র সংসদে ক্ষমতাসীন তৃণমূল ছাত্রপরিষদ ছাত্র সংসদের তহবিল তছরুপ করেছে ; পরিস্থিতি এতদূর গেছে যে, ওদেরই একটি গোষ্ঠী ম্যাগাজিন সেক্রেটারির বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগ এনে থানায় এফ আই আর করেছে। শুধু তাই নয়, ওরা প্রথম বর্ষের ভর্তির সময় ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করেছে। এস এফ আই কর্মীদের তখন কলেজে পাওয়া যায়নি। একমাত্র এ আই ডি এস ও কর্মীরাই ভর্তি নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং অন্যায়ভাবে টাকা নেওয়া বন্ধ করে। তাছাড়া কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রথমবর্ষে ৭৫টি আসন কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। সারা বছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকেছে এ আই ডি এস ও কর্মীরাই। এ আই ডি এস ও'র নেতৃত্বে ফি বৃদ্ধি, ডোনেশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তৃণমূল ছাত্রপরিষদ এবং এস এফ আই নেতারা জানত যে, সারা বছরের কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের সর্বাত্মক সমর্থন রয়েছে এ আই ডি এস ও'র দিকেই। তাই নির্বাচনের দিন ঘোষণার সময় থেকেই একদিকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও অন্যদিকে এস এফ আই কর্মী ও বহিরাগতরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত সাহসের সাথে ওদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে এ আই ডি এস ও'র প্রার্থী হয়। এরপরও এ আই ডি এস ও সমর্থক ছাত্রছাত্রীরা যাতে ভোট দিতে না আসে এবং এলে যাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ বা এস এফ আইকেই ভোট দেয় তার জন্য একইভাবে ওরা চেষ্টা করে। দুটি সংগঠনই প্রচুর অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন রুটে ভোটার আনার জন্য বাস দেয়। তার উপর ভোটের আগের দিন রাত থেকে শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টি চলে ভোটের দিন সারা দিন। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের চেষ্টায় পাড়ায় পাড়ায় অন্যদের সংগঠিত করে ভোট দিতে নিয়ে আসে। টি এম সি পি এবং এস এফ আই গেটে টাকার বাণ্ডিল নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ছাত্রছাত্রীদের কেনার চেষ্টা করে। কিন্তু সকলকে কিনতে পারেনি। তাই মোট ৪১টি আসনের মধ্যে এ আই ডি এস ও ১৬টি আসনে জয়লাভ করে। এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা দুটি আসনে হেরেছে মাত্র ১ ভোটের ব্যবধানে, দু'টি আসনে ২ ভোটের ব্যবধানে এবং একটি আসনে ৩ ভোটের ব্যবধানে। শেষপর্যন্ত এ আই ডি এস ও এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ১৬টি করে আসন পায়। এস এফ আই পায় ৯টি আসন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মুখে বামপন্থার কথা বললেও এস এফ আই পোর্টফোলিও নির্বাচনে ভোটদানে বিরত থেকে চরম প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী শক্তি তৃণমূল ছাত্র পরিষদকে সাহায্য করল। এ আই ডি এস ও এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদ উভয়েই ১৬টি করে আসন পাওয়ায় লটারির মাধ্যমে বিভিন্ন পদাধিকারীরা নির্বাচিত হয়। ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি, ম্যাগাজিন সেক্রেটারি ও গার্লস কমন রুম সেক্রেটারি পদে এ আই ডি এস ও প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়। রঘুনাথপুর কলেজের ছাত্রছাত্রীরা প্রমাণ করল, এ রাজ্যের সংগ্রামী ছাত্রসমাজ এখনও ভয়ভীতি বা অর্থের প্রলোভনের কাছে মাথা নত করেনি।

কাকদ্বীপ কলেজে ১১টি আসনে ডি এস ও জয়ী

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কাকদ্বীপ কলেজে এস এফ আই'র সন্ত্রাস সত্ত্বেও এ আই ডি এস ও ২১টি সিটে লড়ে জিতল ১১টিতে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই এস এফ আই নেতারা স্থানীয় সমাজবিরোধীদের নিয়ে ডি এস ও কর্মীদের উপর নামিয়ে আনে নৃশংস আক্রমণ। এমনকী ছাত্রীরাও তাদের আক্রমণের শিকার হন। ৩১টি আসনের মধ্যে ২১টি আসনে নির্বাচন হয়। বাকী ১০টি আসনে প্রার্থীদের ভয় দেখিয়ে, কলেজ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচন করতে দেওয়া হয়নি। এতদ্‌সত্ত্বেও যে কটি সিটে লড়াই হয়েছে তাতে প্রমাণিত, ভয়ভীতি সন্ত্রাস সত্ত্বেও ডি এস ও'র নেতৃত্বে আন্দোলনের পক্ষেই বেশিরভাগ ছাত্রসমাজ।

এমন সর্বাত্মক বন্‌ধ ওড়িশার মানুষ আগে দেখেনি

২৬ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দিল এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য কমিটি

সুকিন্দার কলিঙ্গনগরে ১ জন নারী ও ১ জন কিশোর সহ ১৩ জন প্রতিবাদী আদিবাসীকে গুলি করে নৃশংস হত্যা এবং ৪০ জনকে আহত করার মধ্য দিয়ে ওড়িশা পুলিশ প্রশাসন ঐ রাজ্যে পুলিশি বর্বরতার নতুন রেকর্ড স্থাপন করল। টাটা ও জিন্দালদের মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিগোষ্ঠীর স্বার্থে ওড়িশা সরকার ও প্রশাসনের এই পুলিশি বর্বরতা অত্যন্ত পরিকল্পিত। ইতিপূর্বে সংঘটিত পারাদ্বীপ গণহত্যা, বুরলা গণহত্যা, কাশিপুর হত্যাকাণ্ড, গোপালপুর ও সোরানায় পুলিশি অত্যাচার ও হত্যাকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের ২ জানুয়ারি কলিঙ্গনগরের গণহত্যা। এই হত্যাকাণ্ডের ধিক্কার জানিয়ে এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য কমিটি ৭ জানুয়ারি ওড়িশা বন্ধের ডাক দেয়। একই দিনে কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে রাজ্যে রাজ্যে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

শিল্পায়নের অজুহাত তুলে ওড়িশা সরকার প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের ও বিদেশের পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। অন্যদিকে, আদিবাসী ও অন্যান্য অংশের সাধারণ মানুষ, যাদের জমি নেওয়া হচ্ছে, হয় তাদের যৎসামান্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে, না হয় কিছুই না দিয়ে বলা হচ্ছে তাদের হাতে জমির পাট্টা নেই, অতএব তারা জমির মালিক নয়। একথা সকলেই জানেন যে, এমন বহু উপজাতিগোষ্ঠী আছে, যারা দীর্ঘকাল ধরে যে জমিতে চাষের কাজ করে আসছে, সেই জমির পাট্টা নেওয়ার জরুরি প্রয়োজনের কথাই তারা জানে না, সরকারও এদের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেনি। আজ সকল রাজ্য সরকারই তথাকথিত শিল্পায়নের নামে দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি টানার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমেছে এবং দেশের ভবিষ্যতের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠের ব্যবস্থা করে দেওয়াসহ গরিব চাষীদের উচ্ছেদ করে চলেছে। ওড়িশা সরকার যেকথাই বলুক, বাস্তবে কলিঙ্গনগরের আদিবাসীদের সরকার কোনও ক্ষতিপূরণও দেয়নি, পুনর্বাসনেরও কোন ব্যবস্থা করেনি। জমি হারানো পরিবারগুলির একজনকে চাকরি দেওয়ার কথা একটি ধাপ্পা, কারণ প্রস্তাবিত শিল্পগুলি হবে প্রধানত পুঁজি ও প্রযুক্তি নির্ভর, সেখানে চাকরির সুযোগ হবে সামান্য। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ বেকারের কথা না ভেবে, বরং আরও হাজার হাজার মানুষকে জমি ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে এই শিল্পায়ন জনগণ মেনে নিতে পারে না। ২ জানুয়ারি কলিঙ্গনগরে টাটা কোম্পানির দেওয়াল নির্মাণের কাজে ২৫ প্ল্যাটুন সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিই প্রমাণ করে, যে কোনরকম প্রতিবাদকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা আগেই করা হয়েছিল।

বিজেডি-বিজেপি সরকারের পুলিশ কর্তৃক কলিঙ্গনগরে গণহত্যার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি আহূত ৭ জানুয়ারি সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবসে কেরালায় মিছিল

এই প্রতারণামূলক শিল্পায়নের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই জাজপুর জেলায় ও সমগ্র ওড়িশা রাজ্য জুড়েই বহুদিন ধরে আন্দোলন চালাচ্ছে। বর্বর গণহত্যার পর লাগাতার আন্দোলন চলছে। ৬ জানুয়ারি জাজপুর কালেকটরেটের সামনে ও সুকিন্দা তহশিলে পৃথকভাবে বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। আদিবাসী জনগণের রাস্তা অবরোধ এখনও চলছে। পাঁচ দফা দাবির ভিত্তিতে ৭ জানুয়ারি ওড়িশা বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই। বন্‌ধ হয়েছে সর্বাত্মক। বন্‌ধের সমর্থনে প্রচার ও পিকেটিং করার জন্য ভুবনেশ্বর, আঙ্গুল, জগৎসিংপুর ও অন্যান্য স্থান থেকে শত শত এস ইউ সি আই স্বেচ্ছাসেবকদের এদিন পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওড়িশা রাজ্য সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত, সর্বাত্মক বন্‌ধের জন্য জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন এবং ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসকে 'প্রতিবাদ দিবস'রূপে পালন করার আবেদন করেছেন।

বিহারের রাঘোপুরে গণহত্যায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে পাটনায় এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

সমস্ত বেকারের কাজ, বেকারভাতা, পরিচয়পত্র, বাস-ট্রাম-ট্রেনে কনসেশনের দাবিতে ও মদের ঢালাও লাইসেন্স, অনলাইন লটারি, সাম্প্রদায়িকতা ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে

রাজ্য যুব বিক্ষোভ সফল করুন

৩১ জানুয়ারি, কলেজ স্কোয়ার, বেলা ১২টা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in